১

সাহিত্যের স্বরূপ ও শ্রেণীবিভাগ

মানুষের জীবনযাপনের রূপ ও প্রকৃতি বিচিত্র। সভ্যতার আদিকাল থেকে এই বিচিত্র-রূপী জীবন উপভোগের জন্য মানুষ কেবল বস্তুগত উপাদানের ওপরই নির্ভর করেনি। সৃষ্টি করেছে অনুভূতি প্রকাশের বিচিত্র আঙ্গিক। আদি মানব পারস্পরিক ভাব আদান-প্রদানের জন্য প্রথম যে ধ্বনিটি উচ্চারণ করেছিলো, তাই সভ্যতার আদি শিল্প। ধ্বনি>শব্দ> ভাষা এই বিবর্তন পরম্পরার মধ্য দিয়ে সঙ্গীত সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পরূপের জন্ম হয়েছে। সভ্যতার একেকটি পর্যায়ে একেকটি সাহিত্য রূপের (Literary Form) জন্ম হয়েছে। মানুষের জীবনযাপনের প্রকৃতি, ভাব ও ভাবনা, চিন্তা ও প্রকাশক্ষমতার বৈশিষ্ট্যই বিভিন্ন যুগে সাহিত্যের রূপ ও শাখাগুলোর জন্ম দিয়েছে। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রধান কয়েকটি আঙ্গিক । বিষয়ভাবনা ও বিন্যাসের দিক থেকে প্রতিটি সাহিত্যরূপই স্বতন্ত্র।

সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে একটি নির্বস্তুক ধারণা। বস্তুর স্বভাব ও প্রকৃতি দিয়ে এর বিচার সম্ভব নয়। আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা, সংবেদনশীলতা প্রভৃতি যে সকল ধারণা আমরা সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি এর কোনোটাই বস্তুস্বভাবকে প্রকাশ করে না। কিন্তু মানুষের বাস্তব জীবনই সাহিত্যসৃষ্টির উৎস। সাহিত্যের স্বরূপ ও শ্রেণীবিভাজনের ক্ষেত্রে এ-কথাগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। ব্যক্তিমানুষ যেমন আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়না, তেমনি মানুষের সৃষ্ট সাহিত্য শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়না।

সাহিত্য-শিল্প যে জীবন থেকে উদ্ভূত - এই ধারণা প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। গ্রীক দার্শনিক ও তাত্ত্বিক পেটো (খ্রি. পূ. ৩য়-৪র্থ শতক) তাঁর Republic গ্রন্থে শিল্প-সাহিত্যসৃষ্টির বেশ ক'টি সূত্র নির্দেশ করেছেন:

১. শিল্পসৃষ্টি হলো অনুকরণ। মানুষের অভিজ্ঞতার জগৎই শিল্পসাহিত্যের অবলম্বন। তিনি মনে করতেন কবির সৃষ্টি অনুকরণের অনুকরণ এবং তা মিথ্যা।
২. শিল্পের সঙ্গে নীতির সম্পর্ক সুগভীর। শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব নৈতিক গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল।
৩. সাহিত্যশিল্প ভাবের বিষয়, জ্ঞানের বিষয় নয়।
৪. দর্শনের সত্য শিল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এই ধারণার ফলে সাহিত্যের সত্য ও দর্শনের সত্যের মধ্যে তিনি কোনো পার্থক্য নির্দেশ করতে পারেন নি।
৫. কাব্যে রূপের চেয়ে ভাবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই সূত্রগুলো থেকে বোঝা যায় পেটো অনুকরণ বলতে অবিকল প্রতিরূপ বোঝাতে চেয়েছেন।

কিন্তু প্লেটোর ছাত্র অ্যারিস্টটল (খ্রি. পূ. ৪র্থ শতক) অনুকরণের বিশেষ লক্ষণ হিসেবে অনুকরণকে প্রাধান্য দিলেন। তাঁর মতে শিল্প এবং সাহিত্যের পার্থক্যের মাধ্যম হলো ভাষা। তিনি অনুকরণ শব্দটিকে গ্রহণ করেছিলেন ব্যাপক অর্থে। তাঁর মতে সাহিত্য জীবনের অনুকরণ — যে জীবনে ঘটনা, অনুভূতি, চিন্তা, কর্ম, বাস্তব অপেক্ষা সত্য হয়ে ধরা দেয়। এই অনুকরণ-তত্ত্বটি দীর্ঘকাল সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে একটি প্রধান মানদন্ড হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

সভ্যতার উষালগ্নে মানুষ ছিলো ভাষাহীন, নিঃশব্দ। তখন মানুষের ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যম ছিলো বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি। পরিবারভুক্ত, যূথবদ্ধ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনেই সৃষ্টি করে ভাষা। সেই প্রয়োজন ছিলো একান্তভাবেই বস্তুগত। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে মানুষের চিন্তা, কর্ম ও অনুভূতির বহুমুখী বিস্তার ঘটে। মানুষের সম্পর্ক যেমন স্থূল, বস্তুসর্বস্ব থাকেনা, তেমনি তার জীবনযাপন ও জীবন উপভোগের ক্ষেত্রেও সংবেদনশীলতা ও সূক্ষ্মতার প্রকাশ ঘটতে থাকে। আদি মানব তার ভাব প্রথম প্রকাশ করে চিত্রের মাধ্যমে — প্রাচীন গুহাগাত্রে এখনও তার নিদর্শন বিদ্যমান। ভাষা আবিষ্কার হবার পর মানুষ ক্রমান্বয়ে তার বিচিত্র ভাবকে আঙ্গিকের আশ্রয়ে প্রকাশ করতে থাকে।

এভাবেই মানুষের আদি শব্দশিল্প কবিতার সৃষ্টি। নাটকের আবির্ভাব হয়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন উপযোগী শিল্পমাধ্যম তৈরির প্রয়োজনবোধ থেকে। সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় এভাবেই মানুষ ক্রমান্বয়ে তার জীবনযাপন, জীবন উপভোগ ও তার সূক্ষ্মতর প্রকাশের প্রয়োজনে বিভিন্ন সাহিত্য আঙ্গিকের সৃষ্টি করেছে। এ-ভাবেই ক্রমান্বয়ে মানুষ তার প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছে উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাঠক্রমে সাহিত্যের উলিখিত শাখাগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই শাখা বা শ্রেণীর স্বরূপ অনুধাবনের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীই কিছু প্রাথমিক মৌলিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই আসবে শ্রেণীবিভাজনের প্রশ্ন। আবার শ্রেণী বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিভিন্ন রূপে বিভক্ত সাহিত্যরূপ বা ফর্ম (যেমন, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ) বুঝতে হলে তার ভাব বা বিষয়বস্তু (Content) এবং গঠনকৌশল (Structure) সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। এ-প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখেই আমরা 'সাহিত্যের স্বরূপ ও শ্রেণীবিভাগ' পর্ব পাঠ্যসূচির শুরুতে অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে সেগুলো উপস্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি:

উদ্দেশ্য, উপরি-উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় ধারণা লাভ এবং সাহিত্যের স্বরূপ, রস ও বিভিন্ন শাখাগুলোকে বিচার করার দক্ষতা অর্জন। একজন স্বাবলম্বী শিক্ষার্থী হয়ে উঠতে সকলেরই যা কাম্য।

- *পাঠ-১. সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ*
- *পাঠ-২. সাহিত্যের রূপ ও রস*
- *পাঠ-৩. কবিতা ॥ অলঙ্কার ॥ ছন্দ*
- *পাঠ-৪. ছোটগল্প*
- *পাঠ-৫. উপন্যাস*
- *পাঠ-৬. নাটক*
- *পাঠ-৭. প্রবন্ধ*

পাঠ-১

সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ◆ সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ লিখতে পারবেন।
- ◆ সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- ◆ সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।
- ◆ সাহিত্যের ভাব ও রূপের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংজ্ঞার্থ

ইংরেজি Literature-এর প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা সাহিত্য শব্দটির ব্যবহার করে থাকি। ভাষার সৌন্দর্য ও আবেগের ক্রিয়াশীলতা যখন শব্দের আশ্রয়ে রূপ লাভ করে তখনই প্রকৃত সাহিত্যের জন্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার লেখকরা সাহিত্যকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যা একটি বিষয়ে অভিন্ন; তাহলো, সাহিত্য হচ্ছে মানুষের সৃষ্ট শিল্প। মানবজীবনে সংঘটিত বিচিত্র ঘটনা এবং বস্তুজগতের উপকরণ সাহিত্যের অবলম্বন হলেও দৈনন্দিনতা ও স্থূলতাকে অতিক্রম করে চিরন্তন হয়ে ওঠে। যেমন ইতিহাসে মানবজীবনের ঘটনার সমাবেশ আছে, কিন্তু তা ঘটনার ব্যঞ্জনা বা সত্য অপেক্ষা বিবরণকেই প্রাধান্য দেয়। বস্তুগত উপকরণ দিয়ে আমরা তৈরি করি অট্টালিকা, যানবাহন, গৃহের আসবাবপত্র প্রভৃতি। ঘটনার বিবরণ তৈরি বা গড়ে তোলায় স্রষ্টার কোনো কৃতিত্ব নেই। কিন্তু সাহিত্যে এ-সব বিষয়ই লেখকের কল্পনা, সৃজনশীলতা, অনুভূতির সূক্ষ্মতা প্রভৃতির আশ্রয়ে সৃষ্ট হয়, যা একই পাঠককে বার বার তৃপ্ত করতে সক্ষম। কিন্তু ঘটনার বিবরণ ও বস্তুগত প্রয়োজনে মানুষের গভীরতম আবেগ, অনুভূতি ও কল্পনাশক্তি উদ্বোধিত হয় না। সাহিত্য হয়ে-ওঠা সম্পদ — তার গ্রহনযোগ্যতা শিল্পগত (Art) সৌন্দর্যের ওপর নির্ভরশীল।

সাহিত্য ব্যাপক ও বিচিত্র একটি ধারণা। রূপের বহুমুখিতা এর বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। প্রতিটি মানুষ মাথা গণনায়ই কেবল স্বতন্ত্র নয়, অনুভূতি, চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিচারেও পৃথক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। সাহিত্যস্রষ্টাও একজন মানুষ। অনুভূতি, সংবেদন, চিন্তাশক্তি ও কল্পনাচারিতায় সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। এজন্যে সাহিত্যিকদের বলা হয়, সমাজের অগ্রসর চেতনার প্রতিভূ। অতীত স্মৃতি, অধীত জ্ঞান, বাস্তব-অভিজ্ঞতা এবং সমকালীন জীবন থেকে উপকরণ আহৃত হলেও একজন সাহিত্যিকের লক্ষ্য ভবিষ্যতকে স্পর্শ করা।

আত্মপ্রকাশ-আকাঙ্ক্ষা মানুষের মৌলিক প্রবণতাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই প্রবণতা মানুষকে সামাজিক হতে সহায়তা করে। একজন সাহিত্য-স্রষ্টা তাঁর আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকেই সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। কবি তাঁর অনুভূতি, আবেগ ও কল্পনাকে অনিবার্য শব্দসমবায়ে উপস্থাপন করেন কবিতায়। আমরা দৈনন্দিন জীবনে অসংখ্য শব্দের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করি। অভিধানের ভেতরেও থরে থরে সাজানো থাকে অজস্র শব্দের কংকাল। কবির কল্পনা ও সৃজনীশক্তি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অসংখ্য শব্দের মধ্য থেকে বেছে নেয় অনিবার্য কিছু শব্দ। আর অভিধানের মৃত শব্দের স্তূপ থেকে কবিতার শরীরে স্থাপন করে শব্দের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেন একজন কবি। এভাবেই মানুষের বস্তুময় জীবনের অন্তরালে মন ও কল্পনার এক ভাবময় জগৎ সৃষ্টি করেন কবি। কবিতায় কবি এবং পাঠকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কিছু অনিবার্য, প্রাণময় শব্দ।

নাটকের উপাদানের পরিসর কবিতার তুলনায় ব্যাপক। নাট্যকার, চরিত্র বা অভিনেতা, মঞ্চ এবং দর্শক বা শ্রোতার সমবায়ে নাটকের সৃষ্টি। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটকের উপাদানও জীবন থেকে গৃহীত হয়। মানুষের জীবন, তার স্বভাব, পরিপার্শ্ব, সমাজ এমনকি রাজনীতি — প্রতিটি ক্ষেত্রেই নাটকের উপাদান কিংবা নাটকীয়তা বিদ্যমান। নাট্যকার সে-সব ক্ষেত্র থেকেই আহরণ করেন নাটকের উপাদান। কিন্তু মনে রাখতে হবে নাটকীয় উপাদান কোনো নাটকের সার্থকতার মানদন্ড নয়। নাটকের আঙ্গিক বা রীতির অনুশাসন সাহিত্যের অন্যান্য রূপ বা আঙ্গিক অপেক্ষা

অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণপ্রবণ। গল্প, কবিতা, কিংবা উপন্যাস মানুষ একা কিংবা সম্মিলিতভাবে পাঠ ও উপভোগ করতে পারে। কিন্তু নাটক উপভোগের জন্য নির্দিষ্ট স্থান, সময় এবং সমষ্টিগত উপস্থিতির প্রয়োজন। এ-কারণে নাটকের গঠনকৌশল সুনিরূপিত, কঠোর ও সতর্ক। নাটক নিয়মের অনুসারী — যার সঙ্গে রয়েছে মঞ্চ এবং অভিনয়ের সম্পর্ক। Performing Art বা প্রয়োগ-সাপেক্ষ শিল্প হিসেবে নাটক একটা স্বতন্ত্র রূপ ও রীতির অনুসারী।

বর্তমান কালে সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় আঙ্গিক হলো উপন্যাস। এর কারণ কেবল উপন্যাসের গঠন বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিহিত নয়, সাহিত্যের অন্য সব শাখার কোনো-না-কোনো বৈশিষ্ট্যের একত্র মিলনও এ-ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। গল্পের বর্ণনাধর্মিতা যেমন উপন্যাসে বিদ্যমান, তেমনি রয়েছে কবিতার অন্তর্ময়তা। নাটকের আকস্মিকতা, সংলাপ, জীবনের আকর্ষণীয় মুহূর্তের নাটকীয় উপস্থাপনও উপন্যাসের শিল্পস্বভাবের অংশ। আবার মননশীল প্রবন্ধের বিশেষণ-ধর্মিতা ও জটিল মানব-অস্তিত্বও তার স্বরূপ উন্মোচনের জন্য প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। বাস্তব পৃথিবীর ঘটনা, চরিত্র, জীবনের বিচিত্র রূপের বিন্যাস ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী রূপায়িত হয় উপন্যাসে। উপন্যাসের উদ্ভব আধুনিক নাগরিক সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আধুনিক জীবনের জটিল, দ্বন্দ্বময় ও বহুমুখী সত্য রূপদানের প্রয়োজনচেতনা থেকে উপন্যাসের সৃষ্টি। যে কারণে উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ণয় যথেষ্ট কঠিন। প্রতিটি উপন্যাসই বিষয়বস্তু ও শিল্পস্বাতন্ত্র্যে অন্য উপন্যাস থেকে পৃথক। তবুও ঘটনাংশ বা plot নির্বাচন, চরিত্রসৃষ্টির কৌশল, ঔপন্যাসিকের জীবন দৃষ্টির মৌলিকত্ব, জীবন সম্পর্কে একটি দর্শন সন্ধানের ঐকান্তিক আগ্রহ উপন্যাসকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে।

গল্প বলা এবং শোনা মানুষের চিরকালীন প্রবণতা হওয়া সত্ত্বেও ছোটগল্পের সৃষ্টি সাহিত্যের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা বেশ পরে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপন্যাসে আমরা জীবনের যে বিস্তৃত রূপের প্রতিফলন দেখি, আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যের কারণেই ছোটগল্পে তা সম্ভব নয়। জীবনের বহুমুখী সত্য উপন্যাসের উপজীব্য। আর ছোটগল্পে বিধৃত হয় জীবনের একান্ত গভীর কোনো একটি অনিবার্য প্রসঙ্গ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ছোটগল্পের জীবন খন্ডিত, অপূর্ণ। উপন্যাসকে আমরা তুলনা করতে পারি মানুষের সমগ্র জীবনের সাথে, যেখানে অসংখ্য ঘটনা, অভিজ্ঞতা, সংঘাত ও সংগ্রামের সমাবেশ। আর ছোটগল্প সেই বিশাল জীবনের একটি অংশ — যারও পূর্ণতা আছে, যার মধ্যদিয়েও জীবনের কোনো একটি সত্যের সমগ্রতা অনুধাবন করা যায়। এজন্যেই বলা হয় , উপন্যাসে আমরা সন্ধান করি জীবনের সম্পূর্ণতা (Entirety) আর ছোটগল্পে সমগ্রতা (Totality)।

প্রবন্ধ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি কোনো সংক্ষিপ্ত গদ্য-রচনা, যা নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করে থাকে। কখনো কখনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে আবার কখনো-বা বিষয়ের অন্তর্গত বক্তব্য বিশেষণের মাধ্যমে পাঠককে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করে। কবিতা, নাটক, গল্প, কিংবা উপন্যাসকে বলা হয় সৃজনশীল সাহিত্যরূপ। আর প্রবন্ধের উপকরণ ও প্রকরণের বৈশিষ্ট্য সৃজনশীলতার স্বভাবধর্ম থেকে দূরবর্তী। প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি কিংবা রাজনীতি। ইংরেজিতে যাকে আমরা Essay বলি প্রবন্ধ অনেকটা তার সমধর্মী। প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভবের যুগে মননশীল গদ্যকার এক ধরনের ব্যাখ্যানমূলক, বিতর্কমূলক ও বর্ণনামূলক রচনার সূত্রপাত করেন, যাকে বলা হতো 'প্রস্তাব'। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মনীষী তাঁদের 'প্রস্তাব' সমূহে সমাজজীবনের বিচিত্র প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-বিশেষণও রামগতি ন্যায়রত্ন 'প্রস্তাব'-এর রূপ বা Form কেই গ্রহণ করেছিলেন।

প্রবন্ধকার আলোচ্য বিষয়ের ওপর নিরাসক্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে যুক্তিশৃঙ্খলায় বিষয় বিশেষণ করেন। ফলে, আধুনিক চিন্তাশীল বিশ্বে প্রবন্ধের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রবন্ধকার সাহিত্যের বিভিন্ন রূপকে যেমন বিশেষণ করেন, তেমনি শিল্প ও জীবনের বিচিত্র প্রসঙ্গকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে বিশেষণ করেন।

উপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট। তা হলো সাহিত্যের প্রতিটি আঙ্গিকেরই বিষয়বস্তু মানুষের বহুধা-বিস্তৃত জীবন। কিন্তু প্রকরণের ধর্ম সেই মানবজীবন-সত্যকেই স্বতন্ত্র রূপাঙ্গিকে বিন্যস্ত করে। কবিতা মূলত অন্তর্ময়— মানুষের আবেগ-কল্পনা-অনুভূতির সূক্ষ্মতর বিন্যাস তার অন্বিষ্ট। নাটকে দেখবো নাট্যকার, অভিনেতা, মঞ্চ ও দর্শক একটা সামবায়িক শিল্পক্ষেত্র রচনা করেছে। গল্প এবং উপন্যাস সাহিত্যের সকল আঙ্গিকের স্বভাব আত্মস্থ করে জীবনের ব্যাপক ও গভীর রূপের উন্মোচন-প্রয়াসী।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ এবং বি.এস.এস. প্রোগ্রামের বাংলা ভাষা (সাধারণ শিক্ষা কোর্স) পাঠক্রমে সাহিত্যের প্রতিটি আঙ্গিক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখকের রচিত কালজয়ী কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের নির্বাচিত পাঠ থেকে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক ধারণা দেওয়াই এই পাঠক্রম প্রণয়নের উদ্দেশ্য। স্বশিক্ষণে-আগ্রহী শিক্ষার্থীরা নির্বাচিত মূলপাঠ, তার উদ্দেশ্য, পাঠোত্তর মূল্যায়ন, চূড়ান্ত মূল্যায়ন, প্রশ্নোত্তরের নমুনা, টীকা প্রভৃতি থেকে প্রতিটি সাহিত্যশাখা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবনের দিকনির্দেশনা পাবেন।

সাহিত্যের যে কোনো রূপ বা আঙ্গিক বিচারের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দুটি মানদন্ড ধরে অগ্রসর হই:

এক : বিষয়বস্তু

দুই : শিল্পরূপ বা প্রকরণ

প্রসঙ্গ দুটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হলেও এ-দুয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শিল্পী বা সাহিত্যিক জীবনের বিচিত্র উৎস থেকে তাঁর অন্বিষ্ট সাহিত্যরূপের (Literary form) উপকরণ আহরণ করেন। ব্যক্তির অস্তিত্বগত অবস্থা, সামাজিক অবস্থান, আশা-আকাঙ্ক্ষা-ব্যর্থতা ও যন্ত্রণার বহুকৌণিক সত্যকেই মূলত লেখকের অবলম্বিত সাহিত্যরূপে স্থান দেওয়া হয়। এ-ক্ষেত্রে লেখক জীবনকে কিভাবে দেখেন এবং উপস্থাপন করেন সেটাই প্রধান বিবেচ্য। অভিন্ন উপকরণ নিয়ে একাধিক লেখক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু বিষয়চেতনা ও শিল্পরূপের ভিন্নতা প্রত্যেক লেখকের সৃষ্টিকেই স্বতন্ত্র করে তোলে। যেমন ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে আমাদের সাহিত্যিকরা অসংখ্য কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। উপকরণ অভিন্ন হলেও লেখকের চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, উপস্থাপনরীতি প্রত্যেক সৃষ্টিকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত হাসান হাফিজুর রহমানের 'অমর একুশে' (বর্তমান পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত) এ-বিষয়ক অসংখ্য কবিতার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। কবির দেশপ্রেম, ভাষা-শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, তৎকালীন স্বৈরশাসকের প্রতি তীব্র ঘৃণা কবিতাটির বিষয়বস্তুকে অসাধারনত্ব দান করেছে। কবিতাটির ভাষা, শব্দব্যবহার ও চিত্ররচনায় বিষয়বস্তু প্রকাশের উপযোগী অনিবার্যতা সৃষ্টি করা হয়েছে। যেখানে ক্রোধ ও সংগ্রামী চেতনা প্রকাশিত , সেখানকার ভাষা নিরাবেগ, তৎসম শব্দবহুল এবং তীক্ষ্ম। আবার স্বজন হারানোর বেদনাময় ভারাক্রান্ত, অশ্রুসিক্ত চেতনার প্রকাশ ঘটেছে সরল-সহজ শব্দসমবায়ে, মাতৃ-মমতার উপযোগী সহজাত ভাষার বিন্যাসে।

মুনীর চৌধুরী রচিত 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের উপাদান বা উপকরণ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। এই ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে একাধিক রচনা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মুনীর চৌধুরীর নাটকটির অভিনবত্ব এর বিষয়চেতনা। যুদ্ধের ঘটনাকে নাট্যকার মানবীয় প্রেম ও যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী আকাঙ্ক্ষার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা'র উপকরণ নর-নারীর প্রেমসম্পর্ক। উপন্যাসে বহুল ব্যবহৃত এই সম্পর্ককে রবীন্দ্রনাথ মানব প্রেমের এক চিরন্তন বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন। যে প্রেম প্রাপ্তির সীমায় বন্দি, তা ক্ষণিক ও ভঙ্গুর — সংকীর্ণ চাওয়া-পাওয়ার সীমাযুক্ত প্রেম মানবিক চেতনাকে করে তোলে অনন্তমুখী। সময়ের চলমানতায় সে-প্রেম চিরকালের মানব-মানবীর।

সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে বিধৃত বিষয়বস্তুকে অনিবার্য ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে , লেখককে সন্ধান করতে হয় যথার্থ প্রকরণ বা শিল্পরূপ । তা না হলে সাহিত্য কেবল বিষয়ের বর্ণনায় পরিণত হবে। ইতিহাসের ঘটনা বর্ণনা-প্রধান বলেই তার আবেদন দীর্ঘস্থায়ী হয় না । ' অমর একুশে' কবিতা হয়ে-ওঠার কারণ ইতিহাসের ঘটনার অন্তঃসারকে কবি অনিবার্য শিল্পপ্রকরণে উন্নীত করেছেন। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য।

সাহিত্যের বিষয়বস্তু (Content) ও আঙ্গিক (Form) অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত। যে-কারণে বিষয়বস্তু প্রকাশ-উপযোগী আঙ্গিক সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলে সে-সাহিত্য দীর্ঘস্থায়ী হয়না। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কবিতায় যে চলমান জীবনসত্যের বিন্যাস ঘটেছে, এর শব্দব্যবহার ও ছন্দে সেই গতি বা প্রবহমানতাকেই অনিবার্যতা দান করা হয়েছে । মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভাষা' কবিতায় বিষয়বস্তু ভাষাপ্রেম ও দেশপ্রেম। কিন্তু সনেটের আঙ্গিক সৃষ্টিতে কবির সামগ্রিক সফলতা কবিতাটির আবেদনকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে। এজন্যেই বলা যায়, বিষয়বস্তু যত গভীর ও ব্যাপক হোক না কেন আঙ্গিক, প্রকরণ বা শিল্পরূপের সম্পন্নতা ছাড়া কোনো সাহিত্য সৃষ্টিই সার্থকতা লাভ করতে পারে না।

বস্তুসংক্ষেপ

সাহিত্য হচ্ছে মানুষের সৃষ্ট শিল্প। সাহিত্য ব্যাপক ও বিচিত্র একটি ধারণা। সাহিত্যের যে কোন রূপ বা আঙ্গিক বিচারের ক্ষেত্রে সাধারণত বিষয়বস্তু এবং শিল্পরূপ বা প্রকরণ— এ দুটি মানন্ড বিবেচ্য। সাহিত্যের বিষয়বস্তু (Content) ও আঙ্গিক (Form) অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত। এই কারণে বিষয়বস্তু প্রকাশে উপযোগী আঙ্গিক সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলে সে সাহিত্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সাহিত্যের প্রতিটি আঙ্গিকেরই বিষয়বস্তু মানুষের বহুধাবিস্তৃত জীবন। কিন্তু প্রকরণের ধর্ম সেই মানবজীবন-সত্যকেই স্বতন্ত্র রূপাঙ্গিকে বিন্যস্ত করে। যেমন, কবিতায় মানুষের আবেগ-কল্পনা-অনুভূতির সূক্ষ্মতর বিন্যাস নিহিত থাকে। নাটকে দেখা যায়, নাট্যকার, অভিনেতা, মঞ্চ ও দর্শক একটা সামবায়িক শিল্পক্ষেত্র রচনা করেছে। গল্প এবং উপন্যাস সাহিত্যের সকল অঙ্গিকের স্বভাব আত্মস্থ করে জীবনের ব্যাপক ও গভীররূপের উন্মোচন প্রয়াসী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সাহিত্য বলতে আমরা কি বুঝি?
২. সাহিত্যরূপ শব্দবন্ধটি কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?
৩. সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে উপকরণ, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিককে আমরা কেন স্বতন্ত্র করে দেখি?
৪. সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীর রূপগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৫. সাহিত্যের বিষয়বস্তু (Content) কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে যা জানেন নিজের ভাষায় লিখুন।

২ নং সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নের নমুনা উত্তর

বিষয়বস্তু ও গঠন-বৈশিষ্ট্যের কারণে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের সৃষ্টি হয়েছে। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্যের একেকটি রূপ বা Form। এই রূপ বা গঠনগত স্বাতন্ত্র্যের কারণেই প্রতিটি সাহিত্য-আঙ্গিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। যেমন কবিতার রূপ গড়ে ওঠে তার ভাবনিষ্ট অন্তর্ময় বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে। প্রবন্ধের অবস্থান তার বিপরীত মেরুতে। প্রবন্ধ বস্তুনিষ্ট ও বিশেষণধর্মী।

পাঠ-২

সাহিত্যের রূপ ও রস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ◆ সাহিত্যের রূপ বা গঠনকৌশল সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- ◆ সাহিত্যের রস বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- ◆ সাহিত্যের স্টাইলের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।
- ◆ রূপ ও রসের স্বতন্ত্র প্রকৃতি বিষয়ে আলোকপাত করতে সক্ষম হবেন।

প্রাককথন

পূর্ববর্তী পাঠে (পাঠ-১) আমরা সাহিত্যের রূপ বলতে তার আঙ্গিক বা বিভিন্ন শাখা (Form) বুঝিয়েছি। বর্তমান পাঠে রূপ বলতে সাহিত্যের অবয়বধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হবে। রস বলতে সাহিত্যের বিষয়বস্তুর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এ-ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য আঙ্গিকের ধারণা ও মতবাদের বিশেষণ স্থান পাবে।

আমাদের চার পাশের দেখা জগৎ প্রধানত দৃশ্যময় ও চিত্রময়। অর্থাৎ বিশ্বজগৎ আমাদের কাছে ধরা দেয় তার রূপ নিয়ে। মানুষ, প্রকৃতি-নদী-বৃক্ষ-সমুদ্র-সবকিছুই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে স্ব-রূপে। সেই রূপ প্রত্যক্ষ করার পর বিচিত্র অনুভূতি, কল্পনা ও স্বপ্নের জন্ম হয় মানুষের মনে। বাইরের জগৎ ও জীবনের যে সব উপাদান সাহিত্য স্রষ্টার মানস-লোকে সঞ্চিত হতে থাকে, সেগুলো সৃষ্টির এক অনুকূল পরিবেশ রচনা করে। এই সৃষ্টিই সাহিত্য।

সাহিত্য উপভোগ ও বিচারের ক্ষেত্রে ভাব ও রূপ শব্দ দুটি আমরা প্রায়শ ব্যবহার করি। এই ভাব ও রূপের পরম ও অনিবার্য মিলনই হলো সাহিত্য। আমরা সাহিত্যিকের যে-সৃষ্টি উপলব্ধি করি, রস আস্বাদন করি – তা প্রকৃতপক্ষে ভাব ও রূপের অখন্ড এক সৃষ্টি। কোনোটিকেই আলাদা করে বিচার করা যায় না। দার্শনিক ক্রোচের মতে শিল্পের প্রথম প্রকাশ ঘটে, শিল্পীর মনোলোকে। আর এই প্রকাশ কল্পনার সাহায্যে বাইরের জগৎ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা বা প্রত্যয়সমূহের আকৃতি বা অবয়ব লাভ। ভাব ও রূপ এভাবেই হয়ে ওঠে অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ভাব ও রূপের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করি। ভাব ও রূপের অনিবার্য মিলনে যে আনন্দময় উপভোগের অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয় রস। ভাবের মতো রূপ বা প্রকাশভঙ্গিও সাহিত্যের উপকরণ। মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত যে-কোনো বিষয় ভাব-রূপের উপাদান হতে পারে। এই ভাব বাস্তব জগতের সঙ্গে সাহিত্যিক বা শিল্পীর সংস্পর্শ থেকে সৃষ্টি হতে পারে, বা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পুরাণ থেকে আসতে পারে অথবা পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কল্পনায় উদিত হতে পারে। তাই ভাব বিচিত্র। কখনো চিন্তা, কখনো অনুভব, কখনো বা স্মৃতি হয়ে এই সব উপকরণ সাহিত্যিকের মনকে অধিকার করে। জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতা সাহিত্যিকের মানসসম্পদ হলেও রূপের মাধ্যমেই তাকে প্রকাশ করতে হবে। একজন পাশ্চাত্য সমালোচক উইলিয়াম হেনরি হাডসন সাহিত্যের রূপরীতিকে অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁর মতে প্রতিটি সাহিত্য রূপের বিন্যাস, সামঞ্জস্য, সৌন্দর্য এবং কার্যকারিতা নির্ধারিত নীতি বা আদর্শ অনুসারে সৃষ্টি করতে হবে। এই নীতির ভিত্তিতেই সাহিত্যের প্রযুক্তিগত কিংবা শৈলীগত উপাদান স্বীকৃতি লাভ করে।

এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবেচনার শরণ নেয়া যেতে পারে। সাহিত্য, সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের তাৎপর্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের রূপ ও রসবৈচিত্র্যের প্রবণতাসমূহ শনাক্ত করেছেন। তাঁর মতে, সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নয়, ভাবের বিষয়। আর এই ভাবজগৎ গড়ে ওঠে 'মানব হৃদয়' 'মানবচরিত্র' ও 'বহিঃপ্রকৃতি' কে আশ্রয় করে। বাইরের এসব উপাদান শিল্পীর মনে 'হৃদয়ভাব' জাগ্রত করে। কিন্তু এই হৃদয়ভাবের সার্থকতা প্রকাশের মধ্যে, অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করার মধ্যে। অন্যের হৃদয়ে সঞ্চার করতে হলে তার রূপসৌন্দর্য ও কলাকৌশলে পরিপূর্ণতা থাকতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মতে 'কলাকৌশলপূর্ণ' রচনা ভাবের দেহের মতো। এই দেহের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যিকের পরিচয়।

পূর্ববর্তী পাঠে (পাঠ-১) আমরা সাহিত্যের যে-সব আঙ্গিকের কথা বলেছি, প্রত্যেকটি আঙ্গিককে সার্থক হতে হলে কলাকৌশলের অনিবার্য ব্যবহার থাকতে হবে। সাহিত্য-সৃষ্টি বলতে আমরা ভাব ও ভাবপ্রকাশের উপায় বা পদ্ধতি উভয়ই বুঝি। এই উপায়টি হচ্ছে রূপ, ভাব হচ্ছে রসের উৎস। ভাবকে যথার্থ রূপে প্রকাশ করতে হলে প্রাসঙ্গিক রসেরও প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

সাহিত্যের রূপ বা প্রকাশভঙ্গির আলোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্যের শৈলী বা Style -এর কথাও এসে পড়ে অনিবার্যভাবে। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে ইংরেজি স্টাইল-এর অনুরূপ যে-শব্দটি আদিকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সে শব্দটি হচ্ছে 'রীতি'। অলঙ্কার শাস্ত্রবিদ আচার্য বামন বলেছেন, 'রীতি' হলো 'পদরচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি' এবং রীতিই হচ্ছে কাব্যের আত্মা — 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। তাঁর মতে মাধুর্য, ওজঃ, প্রসাদ প্রভৃতি গুণে কাব্য বিশিষ্টতা পায়। কাব্যের আত্মা হলো রীতি আর রীতির আত্মা গুণ। আচার্য কুন্তক বলে আর এক ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিক রীতিকে কেবল সাজসজ্জা মনে করেননি। তাঁর মতে রীতি বা প্রকাশভঙ্গি একজন কবির আন্তর-স্বভাবকেই প্রকাশ করে।

পাশ্চাত্যের সাহিত্যভাবনায় স্টাইল-কে বিচিত্রভাবে দেখা হয়েছে। পেটো এবং তাঁর অনুসারীরা ভাব ও রূপের পরম মিলনকেই স্টাইলের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যে-ভাবটি কোনো স্টাইলের মধ্য দিয়ে 'অনিবার্যতা' পায়, সেটাই স্টাইলের সার্থকতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভাষা' কবিতাটির ভাববস্তুর সঙ্গে তাঁর স্টাইলের সম্পর্ক অনিবার্য। এ-কবিতার স্টাইল অন্যরকম হলে এর ভাব বা বিষয় পরিপূর্ণতা পেতো না। অ্যারিস্টটল ও তাঁর অনুসারীদের মতে স্টাইল কোনো গুণ নয় — অনেকগুলো উপাদানের ফল। এই ধারণা পরবর্তীকালে আরও বিচিত্র রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

স্টাইলকে সাতটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. লেখকের নাম-অনুযায়ী স্টাইল। যেমন:

শেক্সপীয়রের স্টাইল
রবীন্দ্রনাথের স্টাইল

২. কালের দিক থেকে। যেমন:

মধ্যযুগীয় স্টাইল
আধুনিক স্টাইল

৩. ভাষার বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে। যেমন:

জার্মান স্টাইল
বঙ্গীয় স্টাইল

৪. অঞ্চলভিত্তিক স্টাইল। যেমন:

গ্রীক স্টাইল
এশীয় স্টাইল

৫. জনসাধারণের রুচি অনুযায়ী। যেমন:

জনপ্রিয় স্টাইল

৬. বিষয় অনুযায়ী স্টাইল। যেমন:

বৈজ্ঞানিক স্টাইল
ঐতিহাসিক স্টাইল
নীতিমূলক স্টাইল

৭. উদ্দেশ্য অনুযায়ী স্টাইল। যেমন:

ভাবপ্রবন স্টাইল
ব্যঙ্গাত্মক স্টাইল

এভাবে স্টাইল বা প্রকাশভঙ্গি সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ক্লাসিক্যাল বা রোমান্টিক স্টাইলের ধারণানীতিও এ-জাতীয় মানসিকতা থেকে উদ্ভুত। যেমন হোমারের 'ইলিয়াড' ও মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ-বধ কাব্য'-কে ক্লাসিক স্টাইলের কাব্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আবার জন কীটস্-এর 'এন্ডিমিয়ন' কিংবা 'হাইপেরিয়ন' এবং রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'সোনার তরী', 'বলাকা' কিংবা অন্যান্য কাব্যগুলো রোমান্টিক স্টাইলের স্বভাবধর্ম লালন করে। ক্লাসিক স্টাইল বলতে বুঝি সুস্পষ্টতা (Objectivity) আর রোমান্টিক স্টাইল হলো ব্যক্তির ভাবময় (Subjective) জীবনানুভবের রূপায়ণ।

ভারতীয় কাব্যবিচারে রসবাদের মূল্য অপরিসীম। এই ধারণা কাব্যের শরীর বা রূপ অপেক্ষা রসকেই কাব্যের আত্মা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বুৎপত্তিগত দিক থেকে রস শব্দের অর্থ হলো আস্বাদন । কাব্যের বিষয়বস্তু অনুসারে পাঠকের মনে বিচিত্র ধরনের অনুভূতির জন্ম হয়। দৈনন্দিন জীবনে বস্তুজগৎ থেকে আমরা যে রস আস্বাদন করি — তা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের রসনার ফল। সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে হবে অন্তরেন্দ্রিয় মন দিয়ে।

রসের উপাদান চারটি:

১. স্থায়িভাব
২. বিভাব
৩. অনুভাব
৪. সঞ্চারীভাব

এই উপাদানগুলোর স্বরূপ ভালোভাবে বুঝলেই রসের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি অনুধাবন করা সম্ভব। মানুষের বাসনালোকে সর্বদাই অসংখ্য ভাব গূঢ়ভাবে বর্তমান। আমাদের চিত্তজগতের এই সব ভাবের গতিবিধি বিচিত্র। এই ভাবগুলো একটি আরেকটি থেকে স্বতন্ত্র। বিচারের সুবিধার জন্য অলঙ্কারশাস্ত্রবিদরা নয়টি ভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এগুলোর নাম— রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং শম। কাব্য বা সাহিত্য পাঠের ফলে বিষয়ের অনুধাবনসূত্রে একেকসময় একেকরূপ ভাবের সৃষ্টি হয়। এই ভাবগুলোর রস-পরিণাম নিম্নরূপ:

রতিভাব— শৃঙ্গাররস
হাস-ভাব— হাস্যরস
শোকভাব— করুণরস
ক্রোধভাব— রৌদ্ররস
উৎসাহভাব— বীররস
ভয়ভাব— ভয়ানকরস
জুগুপ্সাভাব— বীভৎসরস
বিস্ময়ভাব— অদ্ভুতরস
শমভাব— শান্তরস

কেবল কাব্যপাঠের ফলে নয়, যে-কোন সাহিত্যরূপ পাঠের পরিণামে আমাদের চিত্তে একটা রসানুভূতির উদ্ভব হয়। 'বঙ্গভাষা' কবিতায় আত্মনিবেদনের যে শান্তস্নিগ্ধ রূপ পরিলক্ষিত হয়, তাকে শান্তরসের কবিতা বলাই যুক্তিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কবিতায় একাধিক ভাবের মিশ্রণ আছে । কিন্তু মৌলভাব বিস্ময় এবং পরিণামে পাই অদ্ভুত রসের গভীর আস্বাদন। 'অমর একুশে' কবিতায় ক্রোধ এবং উৎসাহ এই দুটি ভাবের স্পন্দন আমরা অনুভব করি। কোথাও কোথাও রৌদ্ররসের প্রকাশ ঘটলেও পরিণামে পেয়ে যাই বীররস।

উপরিউক্ত স্থায়িভাবকে যে-তিনটি উপাদান কার্যে পরিণত করে, সেগুলো হলো — বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব।

বহির্জগতের বিষয়কে আমরা অনুভব করি বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে। দুর্ঘটনা দেখলে আমরা শোকাভিভূত হই। সকালের সুন্দর সূর্যোদয়ের দৃশ্যে আনন্দিত হই, উদ্দাম মিছিলের আহ্বানে উৎসাহ বোধ করি — এগুলোরই রসপরিণাম করুণ, শান্ত কিংবা বীররস।

বিভাব দু প্রকারের:

ক) **আলম্বন বিভাব :** মুখ্যভাবে যে বস্তুকে অবলম্বন (আলম্বন) করে রস উৎপন্ন হয়, তাই আলম্বন বিভাব।

খ) **উদ্দীপন বিভাব :** যে বস্তু বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা রসকে উদ্দীপিত করে অর্থাৎ রস সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে — তাই উদ্দীপন বিভাব। যেমন সুন্দর জোৎস্না রাত, মিছিল প্রকম্পিত নগরী, দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত জনপদ, পুত্র শোকাতুরা জননীর হাহাকার — প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব।

বিচিত্র ভাবের প্রকাশরূপই হলো অনুভাব। যেমন ক্রুদ্ধ হলে আমাদের অভিব্যক্তির রূপ পালটে যায়। আবার বেদনার প্রতিক্রিয়া আমাদেরকে করে অশ্রুসজল, অর্থাৎ হৃদয়ের ভাব-বিকারের বহির্প্রকাশই হলো অনুভাব।

ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাবের স্থায়ী কোনো স্বীকৃতি বা অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বিভাব ও অনুভাবের সংমিশ্রণে রসের সৃষ্টি করে। যেমন আবেগ, স্বপ্ন, লজ্জা, গানি, বিষণ্নতা প্রভৃতি সংশিষ্ট স্থায়িভাবের স্পর্শে একটি রসপরিণামের সৃষ্টি করে। আবেগ থেকে বীররসও হতে পারে। আবার করুণ রসেরও জন্ম হতে পারে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, রসের ধারণাটি প্রাচীন। কিন্তু সাহিত্যের রূপের ধারণা পরিবর্তনশীল । কবিতাকে আদর্শ বা মডেল হিসেবে গ্রহণ করে রসশাস্ত্রের জন্ম। এরপর সময়ের প্রয়োজনে অনেকগুলো সাহিত্যরূপের সৃষ্টি হয়েছে। উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ পাঠে আমাদের মধ্যে কোনো না কোনো রসবোধের সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রাথের 'একরাত্রি' গল্পে রসপরিণাম নিঃসন্দেহে করুণ, মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তরে'র রসপরিণতিও আমাদের মধ্যে করুণরসের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিকে'র রসপরিণাম বীভৎস রসের গভীরে নিক্ষেপ করে পাঠককে।

এভাবেই আমরা দেখবো, সাহিত্যের রূপ ও রস পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। এ-দুয়ের যথার্থ মিলনেই সাহিত্যের সার্থকতা।

বস্তুসংক্ষেপ

ভাব হল সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন। ভাবজগৎ গড়ে ওঠে মানবহৃদয়, মানবচরিত্র ও বহিঃপ্রকৃতিকে আশ্রয় করে। বাইরের এসব উপাদান শিল্পীদের মনে হৃদয়ভাব জাগ্রত করে। কিন্তু এই হৃদয়ভাবের সার্থকতা নির্ভর করে অন্যের হৃদয়ে তা সঞ্চারিত করার মাধ্যমে। অন্যের হৃদয়ে সঞ্চার করতে হলে তার রূপসৌন্দর্য ও কলাকৌশলে পরিপূর্ণতা থাকতে হয়। একাধিক সাহিত্যরূপের সৃষ্টি লক্ষণীয়। উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ পাঠে আমাদের মধ্যে কোন না কোন রসবোধের সৃষ্টি হয়। রসের ধারণাটি প্রাচীন। সাহিত্যের রূপ ও রস পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। এ দুয়ের যথার্থ মিলনেই সাহিত্যের সার্থকতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সাহিত্যের রূপ বলতে আমরা কি বুঝি?
২. সাহিত্যের স্টাইল বা প্রকাশভঙ্গি কাকে বলে?
৩. সাহিত্যের রূপ ও রস কেন অবিচ্ছেদ্য?
৪. বর্তমানকালে সাহিত্যে রসবিচারের উপযোগিতা কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সাহিত্যের রূপ ও রস বলতে কি বোঝেন? রসের উপাদান সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৪ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

রসশাস্ত্র প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের সৃষ্টি। সময়ের বিবর্তনে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো আমাদেরকে বিচিত্র ভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক কাব্যতত্ত্বে আমরা বিষয় অনুসারে কাব্য কিংবা নাটকের বিভিন্ন রসপরিণতি সম্পর্কে জানতে পারি। যেমন গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলোর রসপরিণাম করুণ। মানুষের জীবন-ধরনের পরিবর্তন হলেও মৌলিক স্থায়ীভাবগুলো এখনো ক্রিয়াশীল। প্রকাশরীতির প্রভূত পরিবর্তন হলেও সাহিত্য পাঠের পর আমাদের মধ্যে কোনো না কোন রসাবেদনের সৃষ্টি হয়। এবং এই রসাবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই ঐ সব সাহিত্য পাঠকের মনে স্থায়ী আসন লাভ করে। সুতরাং সাহিত্য যতদিন থাকবে রসও ততকাল থাকবে।

পাঠ-৩

কবিতা ॥ অলঙ্কার ॥ ছন্দ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- কবিতার সংজ্ঞার্থ সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- কবিতার ভাব ও রূপের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- কবিতার বিচিত্র রূপ-রীতি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- প্রধান প্রধান অলঙ্কার সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- ছন্দ কাকে বলে সে-সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।

কবিতা

কবিতা নিয়ে কথা বলা যতো সহজ এর সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা ততোটা সহজ কাজ নয়। কবিতা পছন্দ করেনা পৃথিবীতে এরকম লোকের সংখ্যা খুবই কম। কবিতা সম্পর্কে যতো আলোচনা ও লেখালেখি হয়েছে, সাহিত্যের অন্য কোন রূপ সম্পর্কে তা হয়নি। প্রত্যেক সচেতন সংবেদনশীল মানুষের মধ্যেই কবিতার প্রতি আকর্ষণ রয়েছে। মানুষের বিস্ময়, স্মৃতি, স্বপ্ন, কল্পনার এক অপরূপ মিশ্রণে কবিতার সৃষ্টি। ব্যক্তির অনুভূতি, আবেগ, রহস্যানুভূতি প্রতিফলন ঘটায় প্রতিটি যথার্থ কবিতাই এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। যথার্থ বলার কারণ, অনেক অনুকারী কবিতা আছে যেখানে মৌলিক অনুভবের পরিবর্তে অন্য কোন কবির অনুভূতি, আবেগ ও সৃষ্টিশীল কল্পনার প্রতিধ্বনিই মুখ্য হয়ে ওঠে।

উপরের আলোচনা থেকে অনুমান করা সম্ভব যে, কবিতার সংজ্ঞার্থ নির্ণয় সহজ কাজ নয়। তবুও সাহিত্যের প্রতিটি শাখারই একটি মৌলিক মানদন্ড আছে। সে মানদন্ড বিচার করে কবিতা সম্পর্কেও একটা মোটামুটি ধারণা অর্জন করা যেতে পারে। বিশেষ অনুভূতি প্রকাশের জন্য শব্দগুচ্ছের তাৎপর্যময় বিন্যাস থেকে কবিতার সৃষ্টি। কিন্তু এ-ধারণাও পূর্ণাঙ্গ নয়। আরো সুস্পষ্ট করে বলা যায় আবেগ, অনুভূতি, স্বপ্ন, কল্পনা প্রভৃতি ব্যক্তিমানসের সাধারণ প্রবণতার অংশ; এগুলোর সঙ্গে যখন সৃষ্টিশীলতা যুক্ত হয়, অনিবার্য শব্দের তাৎপর্যময় বিন্যাস তাকে করে তোলে ব্যঞ্জনাময়। তখনই একটি কবিতার জন্ম সম্ভব হয়। এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি কবিতার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিশেষণ থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করতে পারি।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভাষা' কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে মাতৃভাষাপ্রেম ও গভীর দেশাত্মবোধ। কবি সনেটের আঙ্গিকে নিজের জীবনেতিহাস পর্যালোচনা ও আত্মবিশেষণ থেকে মাতৃভাষার টানে স্বদেশ প্রেমে উজ্জীবিত হয়েছেন। চৌদ্দ মাত্রার চৌদ্দ চরণের সংক্ষিপ্ত পরিসরে অনিবার্য কিছু শব্দের বিন্যাসের মাধ্যমে কবি নিজ অনুভূতি, আবেগ, স্মৃতি, স্বপ্ন ও বাস্তব প্রাপ্তির পরিপূর্ণ ছবি তুলে ধরেছেন এই কবিতায়। 'বলাকা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ আবেগের বেগকে সৃষ্টিজগতের অন্তর্নিহিত অবিরাম গতির ছন্দে অনুভব করেছেন। এ-কবিতায় শব্দ-ব্যবহার ও ছন্দ-পরিকল্পনা কবির অনুভূত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কাজী নজরুল ইসলামের 'বাতায়ন পাশে গুবাক-তরুর সারি' কবিতায় প্রেমচেতনা ও প্রকৃতিচেতনার অনুপম মেলবন্ধন ঘটেছে। 'বনলতা সেন' সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের বহুল পঠিত কবিতাগুলোর মধ্যে অন্যতম। ব্যক্তিপ্রেম কিংবা দেশপ্রেম যাই-ই ব্যক্ত হোকনা কেন, হাজার বছরের পথচলার ক্লান্ত পরিব্রাজক যখন উচ্চারণ করে — বলেছে সে, "এতদিন কোথায় ছিলেন?/ পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।" — তখন দেশকালের সীমা লুপ্ত হয়ে মানুষের চিরকাঙ্ক্ষিত শুশ্রূষার মমতাস্নিগ্ধ নারীর মাতৃমূর্তিই প্রধান হয়ে ওঠে। হাসান হাফিজুর রহমানের 'অমর একুশে' ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত কবিতা। এ-কবিতায় মাতৃভাষাপ্রেম ও দেশপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শোষণের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং সংগ্রামের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা।

পাঁচটি কবিতার বিষয়বস্তুর মতো আঙ্গিকরীতিও স্বতন্ত্র। শব্দচয়ন ও ব্যবহারে প্রত্যেক কবির রুচি আলাদা। কিন্তু প্রতিটি কবিতাই আমাদের মধ্যে স্থায়ী আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায়, কবির স্বতস্ফূর্ত অনুভূতি শব্দ ও ছন্দের অনিবার্য বিন্যাসে জীবনের অন্তর্ময় এবং স্থায়ী আবেদন সৃষ্টির উপযোগী যে শব্দসৌধ সৃষ্টি করে তাই-ই কবিতা।

কবিতার শ্রেণীকরণ

প্রতিটি সাহিত্য আঙ্গিকেরই উপাদান মানুষের জীবন, পারিপার্শ্বিক সমাজ অর্থাৎ মানুষের চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে সংশিষ্ট সকল প্রসঙ্গ। জীবনকে দেখার এবং উপস্থাপন করার বৈশিষ্ট্যই সাহিত্যের প্রতিটি আঙ্গিককে স্বতন্ত্র করে দেয়। আবার এইসব সাহিত্যরূপের মধ্যে বিষয়বস্তু, আঙ্গিকবিন্যাস ও ভাষারীতির কারণে শ্রেণীকরণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। কবিতার আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হলে, তার বিভিন্ন শ্রেণীর স্বতন্ত্র-গঠনরীতি, ভাষাবিন্যাস, ছন্দরীতি প্রভৃতি বিষয়ে জানতে হবে।

প্রথমে একটি ছকের সাহায্যে আমরা কবিতার বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান নির্দেশ করতে পারি:

কাব্যনাট্য

আদিযুগে কাব্যভাষাই ছিলো সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন। ফলে, নাটকের প্রাথমিক রূপ কাব্যনাটকেও কবিতার ভাষা ও ছন্দরীতি অনুসৃত হতো। গ্রীক বা রোমান সাহিত্যের স্বর্ণযুগে নাটককে বলা হতো জীবনের অনুকরণ, ঘনিষ্ট প্রতিফলন। এলিজাবেথান যুগের কালজয়ী নাট্যকার শেক্সপীয়রের নাটকগুলো জীবনের বহুমুখী বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করলেও কবিতার রূপরীতিই ছিলো তাঁর প্রধান অবলম্বন। সাধারণ দর্শক-শ্রোতার নিকট গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নাট্যসংলাপের ভাষাকে লৌকিক ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসেন নাট্যকাররা। মৌখিক ভাষার স্পন্দন নাটকের কাব্যগুণকে কিছুটা খন্ডিত করলেও পরবর্তীকালে নাটকে গদ্যভাষার প্রয়োগ অনিবার্য করে তোলে। কিন্তু কাব্যনাট্যের ধারা সাহিত্যের মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়নি। উনিশ শতকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু কাব্যনাটকের রূপরীতি , ভাষা ও ছন্দকে মানুষের পরিবর্তনশীল সাহিত্যরুচির কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে প্রভূত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের সাহিত্য জগতে সৈয়দ শামসুল হক কাব্যনাটক রচনার ক্ষেত্রে গভীর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও শিল্পসাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

মহাকাব্য

কবিতার প্রাচীনতম শাখা যে মহাকাব্য, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গ্রীক Epos শব্দের ইংরেজি রূপান্তর Epic মহাকাব্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ। Epos-এর প্রাচীন অর্থ ছিলো শব্দ। সময়ের বিবর্তনে এই শব্দের ওপর বিভিন্ন অর্থ আরোপিত হয়ে কখনো বিবরণ বা কাহিনী, কখনো গীতি বা বীরত্বব্যঞ্জক কাব্য। এভাবেই অর্থের রূপান্তর ঘটতে ঘটতে এক সময় Epic-এর অর্থ দাঁড়িয়ে যায় আখ্যানমূলক বা বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা।

গ্রীক সাহিত্যতাত্ত্বিক অ্যারিস্টটল তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'পোয়েটিক্স'-এ ট্র্যাজেডির ওপর বিস্তৃত আলোচনা করতে গিয়ে মহাকাব্যের লক্ষণ ও স্বরূপ সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। কাহিনীর বিস্তার-ধর্মিতা, ওজোগুণ-সম্পন্ন শব্দপ্রয়োগ ও হেকটামিটার ছন্দ মহাকাব্যের গঠনরীতির বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য। অ্যারিস্টটল আর যে দুটি লক্ষণের কথা বলেছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম লক্ষণ: বস্তুনিষ্ঠা বা Objectivity — কবির নির্লিপ্ততা, নিরাসক্তি। ঘটনা বা কাহিনীর অন্তরালে কবির নিরপেক্ষ অবস্থান বা আত্মগোপন করার ক্ষমতা।

দ্বিতীয় লক্ষণ: অলৌকিক বিষয়বস্তুকে কাব্যসম্মতভাবে রূপদান করা। এ সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের একটি মন্তব্য মূল্যবান — 'অবিশ্বাস্য সম্ভবের চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য অসম্ভব অনেক বেশি কাম্য'।

মহাকাব্যের বিষয়বিন্যাস ও গঠনকৌশলে বৈচিত্র্য, ব্যাপকতা ও অভিনবত্ব সুস্পষ্ট। এর ঘটনা বা পট গ্রন্থনে আদি-মধ্য-অন্ত্যের ঐক্য থাকতে হবে, নায়ক বীর্যবত্তা ও দক্ষতায় বহুগুণে গুণান্বিত। এর বস্তু-উপাদান জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক তথ্য ও ঘটনা, এর অনুপ্রেরণা-উৎস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐশীশক্তি। মহাকাব্যে মানব-দানব, দেব-দেবী চরিত্রের সমাবেশ ঘটায় অলৌকিকতার প্রয়োগ ঘটে থাকে।

মহাকাব্য দুই প্রকার:

১. জাত মহাকাব্য (Epic of Growth): এতে একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের যূথবদ্ধ জীবনপ্রণালী, মানব-মানবীর আচার-আচরণ-বিশ্বাস, প্রেম-সংগ্রাম বিন্যস্ত হয়। নির্দিষ্ট সময়খন্ডের পরিবর্তে একটি সমাজের অতীত বর্তমানের দীর্ঘ সময়-সীমা জাত মহাকাব্যে অনুসৃত হয়। ব্যক্তিবিশেষ রচনা করলেও জাত মহাকাব্যে সামাজিক ঘটনা-পরিক্রমা ও জীবনের সমাগ্রিক রূপায়ণ ঘটে। বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণ' ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত 'মহাভারতে'র ঘটনা, বিষয়বস্তু ও চরিত্রের বৈচিত্র্য ভারতবর্ষের অদিকালের গোটা সমাজ ব্যবস্থাকেই উন্মোচন করেছে।

হোমার রচিত ইলিয়ড ও ওডেসি প্রাচীন গ্রীসের যৌথ সমাজব্যবস্থার মহাকাব্যিক রূপ। ইলিয়ড-এ ট্রয়যুদ্ধের শেষ পর্যায়ের কাহিনী অবলম্বিত হলেও দশ বছর ব্যাপ্ত যুদ্ধের সমগ্র ছবিই কবির গ্রন্থণ-নৈপুণ্যে এতে বিধৃত হয়েছে। ওডেসিতে ট্রয় যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইথাকা রাজ্যের জনজীবন, নায়ক ওডেসিয়ুসের অবিশ্বাস্য ভ্রমণ ও সংগ্রাম এবং পেনিলোপির বিড়ম্বিত-ভাগ্য জীবন। হোমার ঘটনাভারাক্রান্ত মহাকাব্যে চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

২. সাহিত্যিক মহাকাব্য (Literary epic): এ জাতীয় মহাকাব্য পৌরাণিক ঘটনা কিংবা কোন জাত মহাকাব্যের ঘটনাসূত্র অবলম্বনে কবির যুগমানস, সমাজমানস ও দৃষ্টিভঙ্গির সমবায়ে এক আধুনিক সৃষ্টি। এই শ্রেণীর মহাকাব্যের মধ্যে ভার্জিলের 'ঈনিদ' (Eneid) তাসোর 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড' (Jerusalum Delivered), দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' (Divine Commiedia), জন মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' (Paradise Last) এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্য উলেখযোগ্য। পুরাতনের আশ্রয়ে নতুন যুগের জীবনসত্য প্রতিটি সাহিত্যিক মহাকাব্যেরই বিষয়বস্তু।

গীতিকবিতা

ব্যক্তি-অনুভূতির স্বত:স্ফূর্ত প্রকাশ গীতিকবিতার প্রধান লক্ষণ। সাবলীলতা ও সহজতায় এই কাব্য-আঙ্গিক সর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যময় ও প্রভাবশালী। প্রাচীন গ্রীসে বীণাযন্ত্র সহযোগে যে সঙ্গীত পরিবেশিত হতো , তাকে বলা হতো Lyric । এ থেকে বোঝা যাচ্ছে Lyric বা গীতিকবিতার সঙ্গে সঙ্গীত ধর্মের সম্পর্ক সুনিবিড়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের অনেক কবিতা একই সঙ্গে কবিতা ও গান। তবুও মনে রাখতে হবে সঙ্গীত অপেক্ষা গীতিকবিতার ক্ষেত্র বহুবিচিত্র। মানবীয় অনুভূতির বহুমুখী সত্য গীতিকবিতায় রূপ পায়। সঙ্গীতে থাকে সুরের প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ, আর গীতিকবিতায় কথা ও সুরের সমন্বয়। ফলে, সঙ্গীত অপেক্ষা গীতিকবিতার ক্ষেত্র বহুগুণে বিস্তৃত। ব্যক্তি অনুভূতির সূক্ষ্মতর প্রকাশ অনিবার্য শব্দ, ধ্বনি এবং ছন্দোবিন্যাসে গীতিকবিতায় রূপ পায় বলে আদিকাল থেকেই কবিতার এই রীতি সর্বাধিক চর্চিত সাহিত্যধারা। এ-প্রসঙ্গে মহাকাব্যের সঙ্গে গীতিকবিতার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত পার্থক্যের স্বরূপ নির্দেশ করা প্রয়োজন। মহাকাব্যের বিষয় আঙ্গিক ও পূর্বনিরূপিত আর গীতিকবিতার বিষয়, রীতি ও সময়, সমাজ ও রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মহাকাব্য বস্তুনিষ্ঠ (Objective) আর গীতিকবিতা ভাবনিষ্ঠ (Subjective) কবিতা।

গীতিকবিতার বিচিত্র রূপ-রীতি

লিরিক বা গীতিকবিতার জনপ্রিয়তার ও ধারাবাহিকতা উৎস এর রূপগত বৈচিত্র্য থেকেই অনুধাবন করা সম্ভব।

স্তবসঙ্গীত বা Hymn

সৃষ্টিকর্তা বা দেবতার উদ্দেশে রচিত প্রার্থনামূলক কবিতাকে বলা হয় হিম্ বা স্তব সঙ্গীত। এ ধরনের কবিতা জনসাধারণের সামনে গাওয়া হতো আবার আবৃত্তিও করা হতো। অর্থাৎ সঙ্গীতধর্ম বা কাব্যগুণ উভয়ই স্তবসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তিভাব এ-কবিতার প্রাণ। শ্রোতাসাধারণের মনে মহৎ ভাবনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে স্তবসঙ্গীত রচিত হতো। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে এ-ধরনের সঙ্গীতধর্মপ্রধান কবিতা হয়েছে প্রচুর। বৈষ্ণব পদাবলী,

শ্যামাসঙ্গীত ও বাউল গানে স্তবসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সুস্পট। রবীন্দ্রানাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য', ও 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় স্তবসীঙ্গত বা Hymn এর বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

স্তোত্রকবিতা বা ওড্ (Ode)

বাংলা ভাষায় ওড্-এর কোন প্রতিশব্দ নেই। বিষয়বস্তু ও গঠনবৈশিষ্ট্য অনুসারে একে স্তোত্রকবিতা বলা যেতে পারে। কবি কোনো মহৎ ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ব্যক্তি বা বস্তুর উদ্দেশে সমিল বা অমিল ছন্দে যে কবিতা রচনা করেন তাই-ই ওড্ ব স্তোত্র কবিতা । প্রাচীন গ্রীক কবি পিন্ডার ওড্ রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃত। রোমান কবি হোরেসও বেশ কিছু ওড্ রচনা করেছেন । বাংলা সাহিত্যে সচেতনভাবে ওড্ রচনার সূত্রপাত মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য থেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' কিংবা 'উর্বশী' ওড্-এর আধুনিক রূপায়ণ। ওড্-এর লক্ষণযুক্ত উল্লেযোগ্য সংখ্যক কবিতা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে।

শোককবিতা বা এলিজি (Elegy)

মূল গ্রীক শব্দ Elegia-এর অর্থ হলো বেদনার আর্তি। এই শব্দ থেকে Elegy শব্দের উৎপত্তি। Elegia বা Elegos কেবল শোক অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হতো না। প্রাচীন গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্যে এলিজিয়াক (Elegiac) নামে ৬+৫ মাত্রায় (প্রথমে ছয় পরে পাঁচ) রচিত এক ধরনের কবিতা প্রচলিত ছিলো । সময়ের বিবর্তনে এলিজি বলতে এখন কেবল শোক কবিতাকেই বোঝায়। এ-রীতির কবিতায় কবির ব্যক্তিগত শোক কিংবা জাতীয় শোক রূপায়িত হয়। প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ-বেদনা, কোনো জাতীয় ব্যক্তিত্বের মৃত্যুজনিত উপলব্ধি থেকে শোককবিতার সৃষ্টি। গ্রীক কবি বিয়ন রচিত Lament for Adonis বিশেষ ধরনের শোককবিতা Pastal Elegy-র আদি দৃষ্টান্ত। জন মিল্টনের Licidus এবং শেলির Adonis এই ধারার আরো অগ্রসর পর্যায়ের কবিতা। বিয়নের কবিতা শোকেই শুরু এবং সমাপ্তি। কিন্তু মিল্টন এবং শেলি তাঁদের শোকের মধ্যে প্রত্যাশা ও আনন্দের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। টমাস গ্রের Elegy written in country churchyard সর্বাধিক পঠিত শোক কবিতা। প্রিয়জন কিংবা কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, নাম না-জানা কোনো গ্রামের মৃত কৃষিজীবীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে কবিতাটি। টেনিসনের এলিজিগুচ্ছের নাম In Memorium।

বাংলা ভাষায় শোককবিতা রচিত হয়েছে প্রচুর। কিন্ত সে-তুলনায় কালোত্তীর্ণ কবিতার সংখ্যা কম। প্রায় সকল কবিই শোককে ভাষারূপ দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত স্ত্রীর উদ্দেশে রচিত কবিতা গুচ্ছ 'স্মরণ' শোককবিতারই আধুনিক রূপায়ন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের '২২শে শ্রাবণ-১৩৪৮', মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা 'তিনটি গুলি', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত ' পাথরের ফুল', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সার্থক এলিজির দৃষ্টান্ত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অকাল প্রয়াণে কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন 'চিত্তনামা' । জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' পারিবারিক শোককবিতার অনন্য দৃষ্টান্ত।

সনেট বা চতুর্দশপদী

সনেট শব্দটির উৎপত্তি ইটালিয়ান Soneto (অর্থ: মৃদুধ্বনি) শব্দ থেকে। ইটালীয় কবি দান্তে ও পেত্রার্ক সনেটের আদি রচিয়তা। একটি অখন্ড অনুভূতি যখন ১৪ মাত্রার (কখনো কখনো ১৮ মাত্রাও হয়) ১৪ পংক্তিতে (কখনো কখনো ১৮ পংক্তির ব্যবহারও দেখা যায়) বিন্যস্ত হয়ে আবেগের শিখর স্পর্শ করে, তখনই একটি সার্থক সনেট জন্ম নেয়। বাংলা সাহিত্যের আদি এবং সার্থক সনেট রচিয়তা মাইকেল মধুসূদন দত্ত সনেটের আঙ্গিককে 'চতুর্দশপদী' হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। পরবর্তীকালের সার্থক সনেট রচিয়তাগণ এই রীতিই মূলত অনুসরণ করেছেন। সনেটের প্রথম আট পংক্তিকে বলা হয় অষ্টক (Octave)। এই প্রথম অংশে কবির ভাব বা কল্পনা ঈঙ্গিতময় রূপ লাভ করে। শেষ ছয় চরণকে বলা হয় ষটক (Sestet) — এ-অংশে পূর্ববর্তী ভাবের বিস্তৃতিসাধন বা ব্যাখ্যা দান করা হয়। সনেটের বক্তব্য বিন্যাসের এই রীতি মধুসূদন দত্ত অনুসরণ করেছেন। তাঁর 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি বিশেষণ করলে এ-মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

'বঙ্গভাষা' কবিতার প্রথম আট চরণে (পাঠক্রমভুক্ত কবিতাটি সামনে নিয়ে বসুন) কবি নিজের আত্মরূপান্তরের ঈঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, বঙ্গভান্ডারে বিচিত্র রত্নসম্ভার থাকা সত্ত্বেও তিনি মত্ত থেকেছেন পর-সম্পদ লোভে। পরদেশে (বিদেশে) ভ্রমণ করে জীবনযাপনের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তির মতো নিকৃষ্ট অভিরুচিই ফুটে ওঠে। ব্যর্থ সাধনায় তাঁর জীবনে সাফল্যের পরিবর্তে এসেছে হতাশা। মাতৃভূমি রূপ পদ্মকানন পরিত্যাগ করে শৈবালের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ থেকে নষ্ট করেছেন জীবনের সকল সম্ভাবনার পথ। এই অংশে কবির আত্মবিশেষণ প্রাধান্য পেয়েছে। পরবর্তী ছয় চরণে কবি কুললক্ষ্মী তথা দেশমাতৃকার পথনির্দেশনা পেয়ে যান স্বপ্নে। 'পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে/ মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে॥' অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সতর্কতায় মধুসূদন সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার আঙ্গিক নির্মাণ করেছিলেন।

ব্যালাড (Ballad)

গীতিকবিতার আদিরূপ হিসেবে বিচার করা যায় ব্যালাড বা গীতিগাথাকে। ইতালীয় শব্দ বালারে (ballare) থেকে ব্যালাড শব্দের উৎপত্তি। বালারে শব্দের অর্থ 'নৃত্য করা'। অর্থাৎ কবিতার সঙ্গে নৃত্য ও নাটকীয়তার মিশ্রণে ব্যালাডের সৃষ্টি। ব্যালাড-এ প্রেম, ধর্ম, বীরত্ব, রাজনীতি, সামাজিক প্রসঙ্গ, হাস্যরস ও করুণরসের ঘটনা স্থান পেত। আদি ব্যালাডগুলোর রচয়িতারা অজ্ঞাতনামা। মূলত লোকজীবন তথা গ্রামজীবনের বিচিত্র প্রসঙ্গ ব্যালাড-এ স্থান পেয়েছে। এতে ব্যক্তি কিংবা সামষ্টিক জীবনের বেদনাকরুণ কাহিনীরই প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। আধুনিক রোমান্টিক যুগের কবিরা ব্যালাডের অনুসরণে লিখেছেন প্রচুর কবিতা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, হার্ডি, কোলরিজ, কীট্স, মেরিডিথ, সুইনবার্ন প্রমুখ কবি ব্যালাডের অনুসরণে প্রচুর কবিতা লিখেছেন।

বাংলা ভাষার ব্যালাড জাতীয় আদি রচনা মৈমনসিংহ গীতিকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী' কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় মারাঠী ব্যালাডের অনুরণন আছে। রবীন্দ্রনাথই ব্যালাডের আধুনিক শিল্পসম্মত রূপকার। জসীমউদ্‌দীনের 'নকসীকাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ব্যালাডের নিদর্শন হিসেবে অতুলনীয়।

বাংলা কবিতা

বাংলা কবিতার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ'। ৭৫০ থেকে ১০৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়ারা 'চর্যাপদ' রচনা করেছিলেন। ধর্মের গূঢ় রহস্য এর বিষয় হলেও সমকালের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক এতে প্রতিফলিত হয়েছে। চর্যাপদের পর দীর্ঘকাল সামাজিক-রাষ্ট্রিক অস্থিরতার কারণে কবিতা রচিত হয়নি অথবা রচিত হয়ে থাকলে কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগে প্রবেশ করে বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যের মাধ্যমে। মধ্যযুগে বাংলা কবিতার সমৃদ্ধি ঘটে বিচিত্রধারায়। নাথসাহিত্য, ধর্মমঙ্গল, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, জীবনী কাব্য, অনুবাদকাব্য, রোমান্সমূলক প্রণয়কথা (কারো কারো মতে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান) প্রভৃতি বিষয়ভাবনা ও রূপবৈচিত্র্যে বাংলা কবিতার বিকাশ ও উত্তরণে ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ইউরোপীয় শিক্ষা- সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রভাবে বাঙালি জীবনে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০), হিন্দু কলেজ (১৮১৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭) প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এদেশে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় প্রথম আধুনিক জীবনের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের প্রথম সর্বাঙ্গীন আধুনিক কবি । বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশের হাতে আধুনিক বাংলা কবিতা আন্তর্জাতিক মান স্পর্শে সক্ষম হয়। কবিতার বিষয় ও রূপ-রীতি উদ্ভাবনে বাঙালি কবিরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলা কবিতার এক স্বতন্ত্র ধারা বাংলাদেশের কবিতা। অভিন্ন ভাষায় রচিত হলেও সামাজিক রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কারণে বাংলাদেশের কবিতা পশ্চিমবাংলার কবিতা থেকে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে স্বতন্ত্র। ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের পর ১৯৪৮ থেকে সূচিত ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের কবিতা নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য রক্তদানের অভিজ্ঞতায় আমাদের কবিতায় যে চেতনা জন্ম নেয় পৃথিবীর কোনো দেশের সাহিত্যে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে না। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ থেকে এই সমাজ ও তার কবিতা এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের কবিতা

বাংলাদেশের কবিতায় স্বতন্ত্র ভিত্তি রচিত হয় চলিশের দশকে। সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র ধারার সঙ্গে শিল্পদৃষ্টির নতুনত্ব এ-সময়ের কবিতাকে বিশিষ্ট করেছে। এ-সময়ে আবির্ভূত কবিদের মধ্যে আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৬), আবুল হোসেন (১৯২১-), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-) প্রমুখ উলেখযোগ্য। আবুল হোসেনের 'নববসন্ত' (১৯৪০), ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৫), সৈয়দ আলী আহসানের 'চাহার দরবেশ' (১৯৪৫), আহসান হাবীরের 'রাত্রিশেষ' (১৯৪৭) কাব্যে উপকরণ, জীবনজিজ্ঞাসা ও শিল্পরীতির স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশের কবিতা বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্প-ভাবনায় যুগান্তকারী বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়। এ-সময়ের কবিদের মধ্যে শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবু জাফর ওবায়দুলাহ, সৈয়দ

শামসুল হক, আবদুল গনি হাজারী, আজীজুল হক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী উলেখযোগ্য। ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নবোদ্ভূত মধ্যবিত্তের জীবনচেতনার রূপায়ণে এ-পর্যায়ের কবিতা এক নতুন মাত্রা যোগ করে।

ষাটের দশকে আবির্ভূত কবিদের মধ্যে আবদুল মান্নান সৈয়দ, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, মাহবুব সাদিক, মুহম্মদ নূরুল হুদা, আসাদ চৌধুরী প্রমুখ উলেখযোগ্য। পাশ্চাত্য কবিতার ধ্যানধারণার সঙ্গে ব্যক্তিমানসের নিভৃতচারিতা ও রাজনীতি সচেতনতা এঁদের কবিতার স্বভাবধর্ম।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এ-সময়ে উলেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ কবির আবির্ভাবে বাংলাদেশের কবিতায় নতুন প্রাণবন্যা সূচিত হয়। স্বাধীনতার পর থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কবিতা যাঁদের সাধনায় সমৃদ্ধ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আবিদ আজাদ, সানাউল হক খান, সাজ্জাদ কাদির, সিকদার আমিনুল হক, আল মুজাহিদী, মাহবুব হাসান, হেলাল হাফিজ, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুলাহ, খোন্দকার আশরাফ হোসেন প্রমুখ উলেখযোগ্য।

অলঙ্কার

কবিতার প্রকরণ বা শিল্পরূপ অনুধাবনের জন্য অলঙ্কার, চিত্রকলা বা Image, ছন্দ এবং ছন্দস্পন্দ সম্পর্কে ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। অলঙ্কার শব্দের আভিধানিক অর্থ [অলম্-কৃ (করা) + ঘঞ্ ণ] আভরণ বা ভূষণ। অর্থাৎ যে-সকল উপাদান কবিতার অবয়বকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে তোলে সাধারণ অর্থে তাই অলঙ্কার। কিন্তু কবিতা এমন একটি শিল্পমাধ্যম, যেখানে অলঙ্কার বহিরঙ্গ উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়নি, অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। অনুভূতি বা চেতনা প্রকাশের প্রয়োজনে কবি প্রথমে অনিবার্য কিছু শব্দ নির্বাচন করেন। অতঃপর চেতনা ও শব্দের এমন একটি মেলবন্ধন ঘটান যেখানে একটি থেকে আরেকটিকে বিচ্ছিন্ন করলে কবিতারই অপমৃত্যু হয়।

প্রাচীন গ্রীসে অলঙ্কার-শাস্ত্রে র উদ্ভব হয়। ঐ সময়ে গ্রীক মনীষীরা কাব্যতত্ত্বেরও উদ্ভাবন করেন। এ-দুয়ের মধ্যে তাঁরা সুস্পষ্ট পার্থক্যও নির্ধারণ করেছিলেন। অলঙ্কার বা Rhetoric-এর লক্ষ্য ছিলো কাব্যের বাগ্মিতা ও রচনার গুণাগুণ নির্দেশ করা আর কাব্যতত্ত্ব বা Poetics-এর বিচার্য ছিলো বিভিন্ন সাহিত্য-আঙ্গিকের (যেমন ট্র্যাজেডি, কমেডি, মহাকাব্য প্রভৃতি) প্রকৃতি ও রচনারীতির বিশেষণ। প্রাচীন ভারতেও অলঙ্কারশাস্ত্র এবং কাব্যতত্ত্বের ব্যাপক চর্চা হয়েছে এবং এক পর্যায়ে অলঙ্কার কাব্যতত্ত্বকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। অলঙ্কার সেখানে কবিতার শরীরী প্রসঙ্গে পরিণত হয়েছে। পরবর্তী-সময়ে মানুষের জ্ঞানের বিস্তার, অনুভূতির তীক্ষ তা এর মনোজাগতিক সূক্ষ্মতা অলঙ্কারকে কবিতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত কচ্ছে।

কাব্যপাঠকালে তার দুটি দিক আমাদেরকে প্রথম আকর্ষণ করে: **এক.** কাব্যে ব্যবহৃত পদের শব্দ বা ধ্বনি; **দুই.** তার অর্থ বা Meaning । শব্দ বা ধ্বনি গ্রহণ করি শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে আর অর্থ উপলব্ধি করি মন, অনুভূতি বা বোধ দিয়ে। ফলে, কাব্যের দুটি রূপ প্রকাশ পায়। প্রথমটি বর্ণময় অবয়ব (Concrete) আর অন্যটি অর্থময় চিদ্রূপ (Abstract)। এই রূপগত বিভাজনের ফলেই অলঙ্কার দুই রকমের:

এক. শব্দালঙ্কার

দুই. অর্থালঙ্কার

শব্দালঙ্কারের নিয়ন্তা হলো শব্দ বা ধ্বনি (Sound)। এই ধ্বনি কখনো পদধ্বনি, কখনো বর্ণধ্বনি আবার কখনো বাক্যধ্বনি। শব্দালঙ্কার প্রধানত কবিতার শরীরী ভূষণকে রূপ দেয়। এই অলঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস, যমক, শেষ, বক্রোক্তি প্রভৃতি প্রধান। অর্থালঙ্কারে শব্দ বা ধ্বনির পরিবর্তে অর্থেরই প্রাধান্য পায়। কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, গভীরতা ও ব্যঞ্জনা অর্থালঙ্কারেই নিহিত। অর্থালঙ্কারের পরিধি ব্যাপক। এগুলোর মধ্যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসক্তি, অন্যাসক্তি, বিরোধাভাষ, ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি উলেখযোগ্য।

যে অলঙ্কারকে আমরা কবিতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করেছি, তা আসলে অর্থালঙ্কারের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই ঘটেছে। কবিতার অন্তর্হিত চেতনাকে ব্যঞ্জনাময় ও চিরন্তনতা দানের প্রয়োজনে অর্থালঙ্কারের ভূমিকাই মুখ্য।

চিত্রকল্প বা Image কবিতার জন্য অলঙ্কারেরও অধিক। কবির কল্পলোক উপমান এবং উপমেয়ের নিবস্তুকতায় যে মোহনীয় শব্দচিত্র সৃষ্টি করে, তারই তুঙ্গতম পর্যায়ে চিত্রকল্পের জন্মও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' কবিতার একটি অংশ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:

মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;

উদ্ধৃতাংশে শব্দ, ধ্বনি এবং চিত্র কল্পনার অন্তর্ময় প্রয়োগে যে নিবর্স্তুক (Abstract) ব্যঞ্জনা লাভ করেছে, তার ব্যাখ্যা অলঙ্কারের সূত্র দিতে পারলেও এর অর্থময়তা অনুভূতির গভীরতা দিয়েই অনুধাবন করতে হবে।

ছন্দ

কবিতার রূপবিচারের ক্ষেত্রে ছন্দ চিরকালই স্বীকৃত ও চর্চিত হয়েছে। কেননা, কবিতার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান হলো ছন্দ। একমাত্র কাব্যধর্মী নাটক ছাড়া সাহিত্যের অন্যসব রূপ (Form) থেকে কবিতাকে পৃথক করে এই ছন্দ। সাধারণভাবে ছন্দ (Meter) এবং ছন্দস্পন্দ (Rhythm)-কে আলাদাভাবে দেখানো হলেও সার্থক কবিতার ছন্দ গড়ে ওঠে দুটিরই আশ্রয়ে। ছন্দস্পন্দের সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনিরূপতি রূপই হলো ছন্দ।
বাংলা কবিতায় তিন ধরনের ছন্দের প্রচলন স্বীকৃত:

১. অক্ষরবৃত্ত
২. মাত্রাবৃত্ত
৩. স্বরবৃত্ত

যুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষরের মাত্রাবৈচিত্র্য এবং ঝোঁক (Stress)-এর প্রবণতা অনুযায়ী ছন্দের এই শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। কিন্তু ছন্দবিচারে এগুলোই শেষ কথা নয়। কবিতায় অর্থ ও ধ্বনির মেলবন্ধনে গভীরতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য ছন্দের প্রয়োগকে অনিবার্য হতে হয়। আধুনিক কবিরা জীবনের পরিবর্তন ধর্মকে কবিতায় রূপদান করতে গিয়ে ছন্দ নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ছন্দ হয়ে উঠেছে কবিতায় বিধৃত চেতনার অনিবার্য রূপকলা।

বস্তুসংক্ষেপ ঃ

আবেগ, অনুভূতি, স্বপ্ন, কল্পনা প্রভৃতি ব্যক্তিমানসের সাধারণ প্রবণতার অংশ; এগুলোর সঙ্গে যখন সৃষ্টিশীলতা যুক্ত হয়, অনিবার্য শব্দের তাৎপর্যময় বিন্যাস তাকে করে তোলে ব্যঞ্জনাময়। তখনই একটি কবিতার জন্মও সম্ভব। সাধারণভাবে বলা যায়, কবির স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি শব্দ ও ছন্দের অনিবার্য বিন্যাসে জীবনের অন্তর্ময় এবং স্থায়ী আবেদন সৃষ্টির উপযোগী যে শব্দসৌধ সৃষ্টি করে, তাই কবিতা।

কবিতার প্রকরণ বা শিল্পরূপ অনুধাবনের জন্য অলঙ্কার, চিত্রকলা, ছন্দ এবং ছন্দস্পন্দ সম্পর্কে ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। অলঙ্কার শব্দের আভিধানিক অর্থ [অলম-কৃ (করা)+ঘঞ্] আভরণ বা ভূষণ। অর্থাৎ যে সকল উপাদান কবিতার অবয়বকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে তোলে সাধারণ অর্থে তাই অলঙ্কার। কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ চিরকালই স্বীকৃত ও চর্চিত হয়েছে। কেননা, কবিতার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান হল ছন্দ। কবিতার ছন্দ হয়ে উঠেছে বিধৃত চেতনার অনিবার্য রূপকলা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কবিতা বলতে আমরা কি বুঝি ?
২. কবিতার বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচয় দিন।
৩. মহাকাব্য কয় প্রকার ও কি কি?
৪. গীতিকবিতার রূপবৈচিত্র্যের পরিচয় দিন।
৫. বাংলা কবিতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখুন।
৬. অলঙ্কার কাকে বলে? সংক্ষেপে লিখুন।
৭. বাংলা ছন্দ কয় প্রকার ও কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কবিতার ক্ষেত্রে অলঙ্কারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

১ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

কবিতার সংজ্ঞার্থ নির্ণয় সহজ কাজ নয়। তবুও মনে রাখতে হবে সাহিত্যের সব শাখারই একটি মৌলিক মানদন্ড আছে যার ভিত্তিতে সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা সম্ভব। কবির বিশেষ অনুভূতি প্রকাশের জন্য শব্দের তাৎপর্যময় ও অনিবার্য বিন্যাস থেকে কবিতার সৃষ্টি। আরো ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে আমরা বলতে পারি, আবেগ, অনুভূতি, স্বপ্ন কল্পনা প্রভৃতি ব্যক্তিমানুষের সাধারণ প্রবণতা। এগুলোর সঙ্গে কবির সৃজনশীলতা যুক্ত হয়ে কবিতার জন্ম হয়।

পাঠ-৪

ছোটগল্প

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ছোটগল্পের সংজ্ঞার্থ সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- ছোটগল্পের গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- ছোটগল্পের বিচিত্র রূপরীতির স্বরূপ নির্দেশ করতে পারবেন।

সংজ্ঞার্থ

গল্প বলা এবং শোনার প্রবণতা মানুষের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান থাকলেও সাহিত্যরূপ হিসেবে ছোটগল্পের সৃষ্টি ঊনবিংশ শতাব্দীতে। অর্থাৎ ছোটগল্প সাহিত্যের কনিষ্ঠতম আঙ্গিক। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, এমন কি প্রবন্ধেরও পরে ছোট গল্পের সৃষ্টি। ইংরেজি Story শব্দটির অর্থ ব্যাপক ও বিচিত্র; যেমন, রূপকথা, প্রাচীনকাহিনী, ঘটনার বিবরণ, কল্পিত কাহিনী, সংবাদ, বিবৃতি, গল্প কিংবা উপন্যাস ও নাটকের কাহিনী ইত্যাদি। এই Story শব্দটি ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। ছোটগল্প শব্দবন্ধটিকে আমরা ইংরেজি Short Story শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ করেছি।

গল্প শব্দটির অর্থ অনুধাবন যতোটা সহজ, সাহিত্যরূপ হিসেবে ছোটগল্পের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় ততোটা সহজ কাজ নয়। আমরা জানি, মানুষের আদিম বৃত্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো গল্প বলা এবং শোনা। সেই বৃত্তি ইতিহাসের পথ ধরে উনিশ শতকের শেষার্ধে এসে সাহিত্যিকের সচেতন মনোযোগের বিষয়ে পরিণত হয়। উপন্যাসের মধ্যে আমরা জীবনের ব্যাপক গভীর পরিস্থিতির রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ছোটগল্পে ঘটে একান্ত পরিস্থিতির রূপায়ণ। কিন্তু কেবল আকৃতির পার্থক্য দিয়ে ছোটগল্প ও উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করা যাবে না। ঘটনাংশ, চরিত্র, দৃষ্টিকোণ, পরিচর্যারীতির যথাযথ বিন্যাস দুটো সাহিত্যরূপের জন্যই অনিবার্য। কোনো কোনো ছোটগল্প আয়তনের দিক থেকে উপন্যাসের সমমাপেরও হতে পারে। সুতরাং এ-দুয়ের পার্থক্য নিরূপণের জন্য আমাদেরকে এর প্রকৃতি ও মর্মগত বিভিন্নতার স্বরূপ সন্ধান করতে হয়। বহুমুখীঘটনা, বিচিত্র চরিত্র, সমাজ ও সময়ের বিশাল পট উপন্যাসে মানবজীবনের পরিপূর্ণতা (Entirety) সৃষ্টির লক্ষে গৃহীত হয়। আর ছোটগল্প এই বিশাল জীবনেরই একটা অংশের সমগ্রতা (Totality) ঘটনা, চরিত্র, দৃষ্টিকোণ ও পরিচর্যারীতির দক্ষ বিন্যাসে সৃজন করা হয়। এই Totality বা সমগ্রতা শব্দটি উপন্যাসের স্বভাব নির্দেশের ক্ষেত্রেও কোনো কোনো সমালোচক প্রয়োগ করেছেন। আমরা দুটি সাহিত্যরূপের পার্থক্য নির্দেশের প্রশ্নে পরিপূর্ণতা ও সমগ্রতা শব্দদ্বয় ব্যবহার করছি।

উদ্ভব পর্যায়ের ছোটগল্প রচয়িতাদের মধ্যে এডগার এ্যালান পো-ই (১৮০৯-১৮৪৯) প্রথম লেখক যিনি ছোটগল্প রচনা ও তার সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে মনোযোগী হয়েছিলেন। সাধারণ পাঠকের জন্য সাময়িক পত্রিকা যে গল্পরস সৃষ্টি করে, পো তাকেই বিশিষ্ট শিল্প-আঙ্গিকের মর্যাদায় উন্নীত করেন। কবিতা, নাটক ও উপন্যাসের মতো ছোটগল্পের মধ্যেও তিনি প্রত্যক্ষ করেন পরিপূর্ণ শিল্পরূপের লক্ষণ। আধুনিক বুদ্ধিমান পাঠক তার সক্ষম সংবেদনশীলতা দিয়ে যে ছোটগল্প উপভোগ করতে পারেন, এ- ধারণাকেও তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন। ছোটগল্প আয়তনে ছোট হলেও যে কাঠামোসর্বস্ব নয়, এধারণাকে তিনি ভুল প্রমাণ করলেন। বিষয় ও আঙ্গিকের সতর্ক বিন্যাসে ছোটগল্প একটি জৈব-সমগ্ররূপ প্রাপ্ত হয়। ঘটনা ছোটগল্পের আবশ্যক উপাদান বটে, কিন্তু ঘটনার পর ঘটনার উপস্থাপনা ছোটগল্প নয়। বরং একটি নির্দিষ্ট ভাবের কার্যকারণ-সম্মত বিন্যাস চরিত্রের কর্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়ে ছোটগল্পে রূপ লাভ করে । ঘটনাংশ বা Plot সাহিত্যের প্রতিটি রূপেরই (Form) আবশ্যিক উপাদান। কিন্তু ছোটগল্প উদ্ভবের কালে অন্যান্য সাহিত্যরূপেও ঘটনা অপেক্ষা ঘটনার কার্যকারণ কিংবা ঘটনার প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। পৃথিবীর সব ছোটগত্মকারের মধ্যেই এ-বিষয়ে মনোযোগ ও সতর্কতা লক্ষ করা যায়। বিষয়বস্তু বা ভাবের সঙ্গে এভাবেই ঘটনার ঐক্য নিরূপিত হয়। এডগার এ্যালান পো-র ভাবনা অনুসারে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যকে তিনটি প্রধান সূত্রে চিহ্নিত করা যেতে পারে:

১. ছোটগল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পাঠককে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দান করা (A sense of the fullest satisfaction), আনন্দ দান করা।
২. ছোটগল্প একটি মানবিক শিল্পরূপ — শিল্পীর জীবনবিন্যাসের ব্যাখ্যা এবং অভিজ্ঞতার ঐক্যবদ্ধ সংহত রূপ।
৩. ঘটনাংশ, চরিত্র, পরিবেশ, ঘটনান্তর্গত ভাবসূত্র — এগুলোর সমন্বয়ে ছোটগল্প এক ঐক্যময় শিল্পরূপ।

সময় ও মানবিক রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পের রূপরীতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এডগার এ্যালান পো-র সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ক সূত্রগুলো এখানে প্রাসঙ্গিক। ব্রান্ডার ম্যাথিউজ তাঁর 'Philosophy of the short story' (১৮৮৪) প্রবন্ধে ছোটগল্পের স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন: A short-story deals with a single character, a single event, a single emotion, or the series of emotions cotted forth by a single situation.

'Single' শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ম্যাথিউজ পো উচ্চারিত ঐক্যের ধারণাকেই স্বীকার করে নিলেন। এরপর বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধব্যাপী ছোটগল্পের রূপরীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। তার বিষয় ও আঙ্গিকের ধারণারও এসেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। কোনো কোনো সমালোচক ছোটগল্পকে জীবনের Sketch বা খসড়া হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। চিত্রকলার 'স্কেচ' এবং ছোটগল্প যে এক জিনিস নয়, এ সত্যটি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হলো হার্শেল ব্রিকেল রচিত 'What happend to the short story, (১৯৫১) প্রবন্ধে। তিনি সঙ্গত কারণেই বললেন স্কেচের বৈশিষ্ট্য স্থিতিশীলতা আর ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য গতিশীল। আয়তন বা আকৃতির ছোটো-বড় দিয়ে নয়, বিষয়ের মধ্যে বড় কোন ব্যঞ্জনা এবং সমগ্রতা সৃষ্টি হলো কি-না সেটাই সার্থক ছোটগল্পের স্বভাবধর্ম। এ-প্রসঙ্গে পাঠক্রম-ভুক্ত 'একরাত্রি' গল্পটির উলেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম পর্যায়ের এই ছোটগল্পে ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ এবং ঘটনান্তর্গত ভাবসূত্রকে নিবিড় সংহত রূপ দিয়েছেন। নোয়াখালির প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সেকেন্ড মাষ্টারের স্মৃতিকথনে গল্পের বিষয়বস্তু উন্মোচিত হয়েছে। সুরবালা নাম্মী এক বালিকার সঙ্গে তার শৈশব-কৈশোরের সম্পর্ক, পরে মাটশিনী-গারিবালডি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় গমন, সমাজ ও দেশোদ্ধারের প্রত্যাশায় যৌবনের উজ্জ্বল সৃষ্টিশীল মুহূর্তগুলোর অপচয় এবং শেষে একটি সাধারণ বিদ্যালয়ের সেকেন্ড মাষ্টার হওয়ার ঘটনাক্রম অন্তর্ময় ভঙ্গিতে বিধৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত ব্যর্থতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এ-গল্পে ঘটনা কিংবা চরিত্র কোনোটাই প্রাধান্য পায়নি। সবকিছু মিলিয়ে এক নিবিড় ঐক্যবদ্ধ গল্পরূপ সৃষ্টি হয়েছে। এ-গল্পকে জীবনের খন্ডাংশের রূপায়ণ বলা যাবে না। বরং জীবনের অন্বিষ্ট ভাববস্তুকে একটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র আয়তনে তুলে ধরা হয়েছে। স্কেচ বা খসড়া জীবন ধরা দেয় অস্পষ্ট ব্যঞ্জনাহীন অবস্থায়। কিন্তু ছোটগল্পে ক্ষণকালীন জীবনের মধ্যেও সৃষ্টি হয় চিরকালীন ব্যঞ্জনা। 'একরাত্রি' গল্পের শেষে প্রলয়ংকরী রাত্রের অন্ধকারে সেকেন্ড মাষ্টার ও সুরবালার পাশাপাশি অবস্থান সত্ত্বেও যে একাকিত্ব, নৈঃসঙ্গ্য ও বিচ্ছিন্নতাকে তুলে ধরা হয়েছে, তার ব্যঞ্জনা চিরকালীন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে ছোটগল্পের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ের প্রশ্নে আমরা বলতে পারি, ছোটগল্প এমন এক ধরনের সাহিত্যরূপ, যা নির্দিষ্ট ঘটনাংশকে আশ্রয় করে চরিত্র, পরিবেশ ও ভাবসূত্রের মধ্যে নিবিড় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। এই ভাবসূত্র কখনো গভীর কাব্যিক ব্যঞ্জনায়, কখনো বা নাটকীয় মুহূর্তের উজ্জ্বলতায় আবার কখনো কখনো মানব-মনস্তত্ত্ব বিশেষণের গভীরতায় নিবিড় রসরূপ লাভ করে।

ছোটগল্পের উপকরণ জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্র থেকে গৃহীত হতে পারে। কিন্তু জীবনের যে অংশ লেখকের অন্বিষ্ঠ, তাকে সমগ্র রূপে উপস্থাপন করা সার্থক ছোটগল্পের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

ছোটগল্পের গঠন কৌশল

উপন্যাস এবং ছোটগল্পের প্রকরণের পরিভাষা অভিন্ন। যেমন, দৃষ্টিকোণ (Point of view), ঘটনাংশ (Plot), চরিত্রায়ণ (Characterization), পরিচর্যা (Treatment) প্রভৃতি। কোনো ছোটগল্পকে সমগ্র জৈব-ঐক্যে (Organic whole) রূপ পেতে হলে উলিখিত আঙ্গিক-উপাদানের ব্যবহার আবশ্যিক। মানুষের বহির্জীবন কিংবা অন্তর্জীবনের যে-কোন ক্ষেত্র থেকে ছোটগল্পের উপকরণ আহৃত হতে পারে। নির্মম কঠিন বাস্তব জগৎ, মানবমনের জটিল রহস্য, সংকট ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বহমান জীবনের যে-কোন প্রসঙ্গকে গত্মকার গল্পের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।

দৃষ্টিকোণ হচ্ছে জীবনকে দেখা এবং উপস্থাপন করার বিশেষ ভঙ্গি। ছোটগল্পে বিধৃত ঘটনা, চরিত্র ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ যখন গত্মকার নিরাসক্তভাবে উপস্থাপন করেন, তখন প্রয়োগ ঘটে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের (Author's omniscient point of view) । নায়ক, কেন্দ্রীয় চরিত্র কিংবা গল্পবিধৃত কোনো চরিত্রের কথকতায় গল্পের ঘটনা বর্ণিত হলে, তা বলা হয় উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ (First person's point of view)। এক্ষেত্রে সমগ্র গল্প 'আমি' নামক বক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় লেখক কিংবা কেন্দ্রীয় চরিত্র (নায়ক অথবা কথক চরিত্র-(Teller character) ছাড়াও ঘটনার প্রান্তে অবস্থানকারী কোনো চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পের কাহিনী উপস্থাপিত হয়। এ-পদ্ধতিকে বলা হয় প্রান্তিক চরিত্রের দৃষ্টিকোণ (peripheried character's point of view)। বি.এ/ বি.এস.এস প্রোগ্রামের পাঠক্রমভুক্ত 'একরাত্রি' গল্পটি শুরু হয়েছে এ-ভাবে:

"সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি, এবং বউ-বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড়ো যত্ন করিতেন এবং আমাদের দুইজনকে একত্র করিয়া আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন, 'আহা, দুটিতে বেশ মানায়।"

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনো এক স্কুলের সেকেন্ড মাষ্টারের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উত্তম পুরুষে গল্পের ঘটনা, চরিত্র, চরিত্রের অন্তর্জগৎ, পরিবেশ-পরিস্থিতি উপস্থাপন করতে লেখককে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়। সর্বজ্ঞ

লেখকের দৃষ্টিকোণ অপেক্ষা কথক চরিত্রের মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে ঘটনা বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা অতুলনীয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্প সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। সমাজ ও মানুষের জীবনের যে অনালোকিত প্রান্ত এ-গল্পে উন্মোচিত হয়েছে, লেখকের জীবনাভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও গভীরতা ছাড়া তা সম্ভব ছিলো না। ভিখু, পাঁচী ও বশিরের চরিত্রের গতিবিধি ও অন্তর্জগৎ অবলোকনের জন্য লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের প্রয়োগই যথার্থ।

প্লট (Plot) বলতে আমরা সাধারণত উপন্যাস, নাটক বা গল্পবিধৃত ঘটনাকে বুঝি। ইতিহাসেও তো ঘটনা থাকে। তাকে তো প্লট বলি না, গল্প হিসেবেও চিহ্নিত করিনা। এর কারণ ইতিহাস হলো ঘটে যাওয়ার কাহিনীর বিবরণমাত্র। আর গল্প-উপন্যাসের ঘটনা সময়ের শৃঙ্খলা অনুসারে বিন্যস্ত হয়। এ-কারণেই প্লটকে বলা হয় কার্যকারণ-সম্বন্ধযুক্ত সময়ের বিন্যাস। গল্পবিধৃত চরিত্রও সেই সময়ের মধ্য দিয়ে বহমান।

চরিত্র বা মানব-মানবী যে-কোনো সাহিত্যরূপের মুখ্য উপাদান। দৃষ্টিকোণ ও প্লটের অনিবার্যতায় গল্পে চরিত্রের অবস্থান নিরূপিত হয়। চরিত্রকে একজন লেখক কী প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করবেন — সেই মনোভঙ্গি থেকেই চরিত্রায়ণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

ছোটগল্প কেবল বর্ণনাত্মক শিল্প নয়। পরিবেশ পরিস্থিতি ও চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়োজনে গল্পকার তাঁর বর্ণনাভঙ্গিকে (Narrative situation) বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করেন। দৃষ্টান্তসহ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

'একরাত্রি' গল্পে প্রচন্ড ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে স্কুলের সেকেন্ড মাষ্টার ও সুরবালার পাশাপাশি অবস্থানের চিত্রটি নিম্নরূপ :

"তখন প্রলয়কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিলো না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া গেছে — তখন একটি কথা বলিলেও ক্ষতি ছিলনা — কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশল প্রশ্নও করিল না।

কেবল দুইজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।"

উদ্ধৃত অংশটি কেবল বর্ণনা (Narrative) বা চিত্র (Picture) নয়, এক গভীর কাব্যময়তা এখানে সুস্পষ্ট। সুতরাং এ-অংশের Treatment বা পরিচর্যাকে বলতে হবে কাব্যানুগ বা Poetic ।

সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্'র 'নয়নচারা' গল্পের শুরুটি এরকম:

"ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটিকে ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে। কিন্তু মনের চরে যখন ঘুমের বন্যা আসে তখন মনে হয় ওটা সত্যিই ময়ূরাক্ষী: রাতের নিস্তব্ধতায় তার কালো স্রোত কল-কল করে, দূরে আঁধারে দেখা তীররেখা নজরে পড়ে একটু-একটু, মধ্যজলে-ভাসন্ত জেলেডিঙ্গিগুলোর বিন্দু বিন্দু লালচে আলো ঘন আঁধারেও সর্বংসহা তারার মতো মৃদু-মৃদু জ্বলে।"

গল্পটিকে সূত্রানুসারে সর্বজ্ঞ-লেখকের দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত মনে হলেও, গভীর বিবেচনায় দুর্ভিক্ষপীড়িত নয়নচারা গ্রাম থেকে শহরে আগত আমুর দৃষ্টিতেই এর ঘটনা ও বিষয় বিন্যস্ত হয়েছে। উদ্ধৃতাংশের প্রতিটি বাক্যই ব্যঞ্জনাময়, প্রতীকী। জনশূন্য রাস্তাটিকে ময়ূরাক্ষী নদী হিসেবে প্রতিভাত হওয়ার কার্যকারণ আমু চরিত্রের দৃষ্টিকোণ প্রয়োগের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এ-অংশের পরিচর্যায় কাব্যময়তা ও প্রতীকী (Symbolic) কৌশলের অপরূপ মিশ্রণ ঘটেছে।

ছোটগল্পের আয়তন নিয়ে এডগার এ্যালান পো-সহ প্রথম যুগের গত্মকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু আয়তন ছোটগল্পের স্বরূপ নির্দেশের জন্য যথেষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্টমাষ্টার' এবং 'নষ্টনীড়' গল্প আয়তনের দিক থেকে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ধারক। 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পের সীমিত আয়তনে দুটি চরিত্রের অন্তর-বাহির সংহত রূপ পেয়েছে। আর 'নষ্টনীড়' আয়তনের দিক থেকে উপন্যাসোপম। কিন্তু ঘটনা ও চরিত্রের একাগ্র সমগ্রতা গল্পটিকে অনন্যতা দান করেছে।

ছোটগল্পের রূপবৈচিত্র্য

আধুনিক কালে ছোটগল্প জীবনের বহুমুখী জটিলতার স্পর্শে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। তবে গঠন-বৈশিষ্ট্য অনুসারে ছোটগল্পকে প্রধানত তিনটি প্রবণতায় চিহ্নিত করা যায় :

১. ঘটনাপ্রধান গল্প
২. চরিত্র-প্রধান গল্প
৩. ভাব বা বিষয়বস্তু প্রধান গল্প।

গল্প রচনার প্রথম পর্যায়ে ঘটনা প্রধান গল্পেরই আধিক্য ছিলো। ঘটনার বৈচিত্র্য ও ঐক্যই ছিলো ঐ ধারার গল্পের বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিচরিত্রের নানামুখী রূপ বিধৃত হয় চরিত্রপ্রধান গল্পে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অতিথি', 'হৈমন্তী' ও 'স্ত্রীরপত্র' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সতী', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারিণী মাঝি', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' চরিত্র প্রধান গল্পের দৃষ্টান্ত। চরিত্র মানুষের ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। চরিত্রপ্রধান গল্প কখনো কখনো বক্তব্যের গভীরতায় বিষয়বস্তু-কেন্দ্রিক হয়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রপ্রধান অধিকাংশ গল্পই এর দৃষ্টান্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' সমাজতান্ত্রিক জীবনদৃষ্টির সঙ্গে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন-তত্ত্বের সমন্বয়ে এক গভীরতর বক্তব্যের শিল্পরূপ হয়ে উঠেছে। ফলে বিষয়প্রধান গল্পের স্বভাবধর্ম এ-গল্পেও লক্ষণীয়।

ভাব বা বিষয়বস্তু প্রধান গল্পে মানুষের বিচিত্র উপলব্ধি, অনুভূতি বা মানসিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে। জীবনকে গভীর এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করার ফলে এ-জাতীয় গল্পে কাব্যময়তা ও দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটে কখনো কখনো । গল্পের এই প্রধান তিনটি ধারাকে বিষয় ও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আরো উপশাখায় ভাগ করা যায়। অবশ্য এক গল্পে একাধিক প্রবণতার মিশ্রণও ঘটে কখনো কখনো। যেমন,

১. মানব সম্পর্ক বিশেষণমূলক গল্প। ব্যক্তিসম্পর্কের বিচিত্র দিক এই জাতীয় গল্পে বিধৃত হয়।
২. সমাজবিষয়ক। এ-জাতীয় গল্পে সমাজজীবনের বিচিত্র প্রসঙ্গের উপস্থাপন ঘটে। বিশেষণের দক্ষতা ও গভীরতায় রাজনীতির তত্ত্ব, আদর্শ ও ঘটনারও প্রতিফলন ঘটে সমাজ-বিশেষণমূলক গল্পে।
৩. মনস্তাত্ত্বিক। মানবমনের রহস্যময় দিক বিশেষণের মাধ্যমে এ-জাতীয় গল্পে বিধৃত হয়।

এই তিনটি উপশাখার মধ্যে প্রেমসম্পর্ক, প্রকৃতির পটভূমিতে মানবঅস্তিত্বের কর্ম ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রভৃতির রূপায়ণ ঘটে।

দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও ছোটগল্পকে কয়েকটি উপশাখায় বিন্যস্ত করা যায়। যেমন,

১. রোমান্টিক
২. হাস্যরসপ্রধান বা ব্যঙ্গমূলক।

লেখকের অন্তর্মুখী গীতময় জীবনচেতনা রোমান্টিক গল্পের বৈশিষ্ট্য। হাস্যরসপ্রধান গল্প কেবল বিশুদ্ধ হাসিরই সৃষ্টি করে না, কখনো কখনো গভীর ইঙ্গিতময় বক্তব্যও প্রদান করে।

পদ্ধতি বিচারেও ছোটগল্পকে একাধিক শাখায় বিন্যাস করা যায়। যেমন,

১. কাব্যিক
২. রূপকধর্মী

এ-ছাড়া অতিপ্রাকৃত, প্রতীকধর্মী, বিজ্ঞান নির্ভর, ইতিহাস-আশ্রয়ী, গার্হস্থ্যজীবনের প্রাত্যহিকতা নির্ভর, ফ্যান্টাসি বা উদ্ভট বিষয়ের আশ্রয়েও ছোটগল্প লিখিত হতে পারে।

বিগত দুই শতাব্দীতে ছোটগল্পের রূপ ও রীতির বহুমুখী পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের জীবনবিন্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পে বিষয়ের পরিধিও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গল্পের উপকরণের জগৎ হয়েছে বিস্তৃততর। যন্ত্র, কফিন, বাস্তবজীবনের ব্যাখ্যাতীত কোনো বিষয়ও এখন গল্পের উপাদান।

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস

সাহিত্যরূপ হিসেবে ছোটগল্পের উদ্ভব ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ছোটগল্পের প্রথম ও প্রধান শিল্পী হলেও তাঁর পূর্বে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত — প্রমুখ লেখক গল্পরচনায় পটভূমি প্রস্তুত করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) নামক অনুবাদ গ্রন্থটির ঘটনা উপস্থাপনায় গল্পরসের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অতুলনীয়। কেননা, ছোটগল্প যে একটি স্বতন্ত্র সাহিতরূপ (Literary form) এই ধারণাটি রবীন্দ্রনাথের গল্পেই প্রথম ধরা পড়ে। ইতোপূর্বে যাঁরা ছোটগল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারা কাহিনী বর্ণনার মধ্যেই পরিতৃপ্তি সন্ধান করেছেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'ভিখারিণী' গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মাত্র ষোল বছর বয়সে রচিত এই গল্পে ছোটগল্পের বিষয়বস্তু, রূপ ও রীতির সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এরপর ১৮৯১ সাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে রবীন্দ্রনাথ ৯৩টি ছোটগল্প এবং আরো কিছু গল্পধর্মী সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেছেন। ঊনবিংশ শতব্দীতেই রবীন্দ্রনাথ ৫০ এর অধিক ছোটগল্প রচনা করেন। যার মধ্যে 'পোষ্টমাষ্টার', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন,' 'কঙ্কাল', 'একরাত্রি', 'কাবুলিয়ালা', 'শাস্তি,' 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'অতিথি'র মতো গল্প রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্বমানে পৌঁছে দেন। বিষয়-বৈচিত্র্য ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে পৃথিবীর আর কোনো গত্মকারকে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ মনে করা যায় না। 'নষ্টনীড়,' 'হৈমন্তী,' 'স্ত্রীরপত্র,' 'পয়লা নম্বর,' 'ল্যাবরেটরি' প্রভৃতি গল্পে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় সৃষ্টিসামর্থ্যের পরিচয় মেলে।

রবীন্দ্রনাথের পর যাঁরা বাংলা ছোটগল্প রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬২), প্রমুখ উলেখযোগ্য। শরৎচন্দ্রের গল্প অভিজ্ঞতার দিক থেকে অভিনব হলেও রূপরীতি বিচারে রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য নয়। প্রমথ চৌধুরী ও ধূর্জটিপ্রসাদ মননশীল জীবনচেতনাকে ছোটগল্পের উপাদানে পরিণত করেন। এ-সময়ই আবির্ভূত হন আরো কয়েকজন ক্ষমতাধর গল্প লেখক। এঁরা হলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, (১৮৪৭-১৯১৯), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯৩২), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১), সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) প্রমুখ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বাঙালির জীবনচেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে, তার প্রতিফলন ছোটগল্পেও অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রচলিত মূল্যবোধ, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ধারণা , সংস্কার ও বিশ্বাস নতুন ধারার গত্মকারদের নিকট তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। এ-সময়ে উদ্ভূত গল্পলেখকদের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), মনীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭-১৯৮৬), দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১), গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫), অচিন্ত্যকুমার

সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৭), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৬৭), জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৬৭), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) প্রমুখ উলেখযোগ্য।

জীবনের প্রাত্যহিক বাস্তবতা, সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র , নারীপুরুষের সম্পর্কের জটিলতা, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন, সুস্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শনিষ্ঠা এ-সময়ের গল্পের বৈশিষ্ট্য। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক ছোটগল্পের অবয়বে মানবজীবনের দৈহিক ও মানসিক সম্পর্কের জটিল দিকগুলোকে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। দীনেশরঞ্জন দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ লেখক জীবনের বাস্তব চিত্র, রাজনৈতিক আদর্শ ও জিজ্ঞাসাকে ছোটগল্পে রূপ দিলেন। বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় চিরচেনা জীবন থেকে উপকরণ আহরণ করলেও অভিজ্ঞতা ও বিন্যাসের অভিনবত্বে তাঁদের গল্প বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। গল্পের বিষয়বস্তুর মতো আঙ্গিক-নিরীক্ষায়ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর গল্পলেখকরা সচেতনভাবে মনোনিবেশ করলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের গল্পলেখকদের ব্যতিক্রমী জীবনদৃষ্টি ও বিষয়ভাবনার সমান্তরালে উপাদান ও উপস্থাপনার অভিনবত্বে আরো একটি স্বতন্ত্র গল্পের ধারা লক্ষ করা যায়। এই ধারার গত্মকাররা হলেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭), বনফুল ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯), সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২), মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭),প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০১-১৯৯৯), শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৫), গজেন্দ্রকুমার মিত্র(১৯০৮), আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯) প্রমুখ । কৌতুক-হাস্যরস ও বিদ্রুপ এঁদের গল্পের উপজীব্য হলেও জীবনের বর্ণনা অপেক্ষা বিশেষণকেই তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তীকালে আবির্ভ ত গল্প লেখকদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ (১৯১০-১৯৭০), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), সোমেন চন্দ্র (১৯২০-১৯৪২) উলেখযোগ্য। সমাজ-অভিজ্ঞতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ছোটগল্পের বিষয় ও রীতির ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, উলিখিত লেখকদের গল্পে তার প্রমাণ সুস্পষ্ট।

বাংলাদেশের ছোটগল্প

ভৌগোলিক-সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ড আদিকাল থেকেই ছিলো স্বতন্ত্র। মূলত নদীমাতৃক ও ভূমিনির্ভর এই দেশ ও তার জনগোষ্ঠী জীবনোপকরণ, জীবনযাপন ও অস্তিত্ব সাধনায় গোড়া থেকেই বাস্তবমুখী ও সংগ্রামশীল। উনিশ শতকে ইংরেজি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রভাবে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে ভৌগোলিক অবস্থান ও ইংরেজ রাজশক্তির অসহযোগিতার ফলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ)তা ঘটেনি। এ-দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যাত্রা শুরু হয় বিংশ শতাব্দীতে । ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে এই মধ্যবিত্তশ্রেণী চেতনা ও জীবনযাপনের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে শুরু করে। যে-কারণে ১৯৪৭-খ্রিস্টাব্দে দেশবিভাগের পূর্বেই এ-দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সাহিত্যসাধনার স্বতন্ত্র পটভূমি রচনায় সমর্থ হয়। এ-পর্যায়ের গত্মকারদের মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৬), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৯), সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্ (১৯২২-১৯৭১) প্রমুখ উলেখযোগ্য। এ-ভূখন্ডের স্বতন্ত্র জীবনধারা, অস্তিত্ববিন্যাস, মানবসম্পর্ক প্রভৃতি এই গল্পলেখকদের মুখ্য উপজীব্য। উলিখিত গত্মকারদের অনেকেই দেশ বিভাগের পরও গল্পচর্চা করেছেন। কেবল কলকাতা-কেন্দ্রিক ছোটগল্প নয়, বিশ্বমানের ছোটগল্প রচনায়ও যে কেউ কেউ পারদর্শী ছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দেশবিভাগের পর যাঁরা ছোটগল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের হাতেই বাংলাদেশের ছোটগল্প সমৃদ্ধি লাভ করেছে। শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৮), সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯১৮-১৯৮৬), মিরজা আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৮৫), শাহেদ আলী (১৯২৫-), আবু ইসহাক (১৯২৬-), আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী (১৯৩১-), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-), জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-) প্রমুখ লেখকরা বাংলাদেশের ছোটগল্পকে বিষয়বিন্যাস ও আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যমন্ডিত করেছেন।

বাংলাদেশের ছোটগল্প এখন বিচিত্র বিষয় ও নিরীক্ষাশীল শিল্পরূপের বাহন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের পর ছোটগল্প হয়ে ওঠে আমাদের সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধশাখা। প্রবীণ এবং নবীন মিলিয়ে প্রচুর গল্প লেখক এখনো সৃষ্টিশীল। এঁদের মধ্যে শওকত আলী (১৯৩৬-) হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-), জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (১৯৩৯-) রাহত খান (১৯৪০-), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৮), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-) বাংলাদেশের ছোটগল্পকে বিষয়ভাবনা ও শিল্পরূপের দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বস্তুসংক্ষেপ: ছোটগল্প এমন এক ধরনের সাহিত্যরূপ যা নির্দিষ্ট ঘটনাংশকে আশ্রয় করে চরিত্র, পরিবেশ ও ভাবসূত্রের মধ্যে নিবিড় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। এই ভাবসূত্র কখনো গভীর কাব্যিক ব্যঞ্জনায়, কখনো বা নাটকীয় মুহূর্তের উজ্জ্বলতায়, আবার কখনো কখনো মানব-মনস্তত্ত্ব বিশেষণের গভীরতায় নিবিড় রসরূপ লাভ করে। ছোট গল্পের উপকরণ জীবনের যে কোন ক্ষেত্র থেকে গৃহীত হতে পারে। কিন্তু জীবনের যে অংশ লেখকের অন্বিষ্ঠ, তাকে সমগ্র রূপে উপস্থাপন করা সার্থক ছোটগল্পের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ছোটগল্প কাকে বলে?
২. ছোটগল্পের সঙ্গে উপন্যাসের মৌলিক পার্থক্য কোথায়?
৩. ছোটগল্পের গঠনবৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৪. প্রবণতা অনুসারে ছোটগল্পের শ্রেণীকরণ করুন।
৫. বাংলা ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ছোটগল্পের গঠনকৌশল সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।
২. ছোটগল্পের রূপবৈচিত্র্য বিষয়ে আলোচনা করুন।

১ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তর:

ছোটগল্প সাহিত্যের আধুনিক আঙ্গিক । আধুনিক ব্যক্তিমানুষের বিচিত্রমুখী জিজ্ঞাসার রূপায়ণ ঘটে ছোটগল্পে। ফলে, ছোটগল্পের গঠনরীতির মধ্যেও আধুনিক জীবনের জটিল চিন্তা ও কর্মের প্রতিফলন অনিবার্য হয়ে ওঠে। একটি সার্থক ছোটগল্পের রূপগঠনে প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত উপাদানগুলোর ব্যবহার আবশ্যিক:

ক. দৃষ্টিকোণ,
খ. পট বা ঘটনাংশ
গ. চরিত্র
ঘ. পরিবেশের ব্যবহার
ঙ. সময়ের বিন্যাস
চ. পরিচর্যা কৌশল

দৃষ্টিকোণ হলো ছোটগল্পের সংজ্ঞানির্ণায়ক উপাদান। লেখক কীভাবে জীবনকে অবলোকন করবেন এবং পাঠকের সামনে তুলে ধরবেন দৃষ্টিকোণ তা নির্ধারণ করে। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' গল্পে 'আমি' নামক কথকের অর্থাৎ উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যক্তির আত্ম-স্বরূপ উন্মোচনের এটাই যথার্থ পদ্ধতি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' এবং সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্‌র 'নয়নচারা' গল্পে বিষয়ের সূত্রেই লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। অন্বিষ্ট জীবনকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিই ছিল অনিবার্য। গল্পের পট হল সময়ের মধ্য দিয়ে বহমান মানবচরিত্রের চিন্তা ও কর্মের পারম্পর্যময় বিন্যাস। সময়ের কার্যকারণ-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এ-ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সময় এবং স্মৃতি ও স্বপ্নলোকে সঞ্চরণশীল সময় অভিন্ন নয়। 'নয়নচারা' গল্পের আমুর স্মৃতি ও বাসনালোকে এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'অপঘাত' গল্পের মোবারক আলির অবচেতনার জগতে সময় ঘটনার সমান্তরালে বিন্যস্ত হয়নি। অর্থাৎ সময় এ-ক্ষেত্রে হয়েছে চরিত্রের চেতনাসাপেক্ষ বাস্তবতার অনুরূপ। সময়ের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কও সুনিবিড়। পরিচর্যা-কৌশল গল্পের অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করে। ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে পরিচর্যারীতির অনিবার্য সঙ্গতি কোনো গল্পের শিল্পসার্থকতার অন্যতম প্রধান মানদন্ড। একটি গল্পের সূচনা ও সমাপ্তি, প্রতিপাদ্য ও রসনিস্পত্তির ঐক্য উলিখিত উপাদানগুলোর অনিবার্য বিন্যাসের মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়।

পাঠ-৫

উপন্যাস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- উপন্যাস কাকে বলে সে বিষয়ে লিখতে পারবেন।
- উপন্যাসের গঠনকৌশলের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- উপন্যাসের রূপগত বৈচিত্র্য নির্দেশ করতে পারবেন।

সংজ্ঞার্থ

সাহিত্যের আঙ্গিকগুলোর মধ্যে উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা দুরূহ কাজ। কেননা, সময় ও সমাজের এতো বিচিত্রমুখী ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন ও ভাঙা-গড়ার যুগে উপন্যাসের আবির্ভাব হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কোনো মানদন্ড দিয়ে উপন্যাসের স্বভাবধর্ম নিরূপন করা সম্ভব নয়। উপন্যাসের উদ্ভবের সঙ্গে সমাজবিন্যাস, আর্থ-উৎপাদন কাঠামো, মানুষের মনোজাগতিক সূক্ষ্মতা এবং অস্তিত্বজিজ্ঞাসার জটিল ক্রমবিকাশের প্রশ্ন জড়িত। রেনেসাঁ বা নবজাগরণ-পরবর্তী মানুষের নতুন জীবন - ভাবনা, বাণিজ্যপুঁজির আশ্রয়ে গড়ে-ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপুল বিস্তার এবং শিল্পবিপ্লব-উত্তর নাগরিক সভ্যতার দ্বন্দ্বসংঘাতপূর্ণ, জটিল, বৈচিত্র্যময় ও গতিশীল জীবনের শিল্প-আঙ্গিক হিসেবে ইউরোপে উপন্যাসের উদ্ভব। সুতরাং উপন্যাস তার জন্মলগ্নেই সমাজ ও জীবনের বাস্তবতার অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে। এই বাস্তবতার চরিত্র সমাজ ও ব্যক্তিভেদে বিচিত্র।

উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে, তার বিষয় ও আঙ্গিকের স্বরূপ নির্ধারণে আলোচনার শেষ নেই। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সমালোচকগণ দীর্ঘকাল ধরে বিতর্ক ও বিশেষণে আত্মনিয়োগ করেছেন, কিন্তু কোনো মীমাংসিত সিদ্ধান্তে তাঁরা উপনীত হতে পারেন নি। তবুও স্বভাবলক্ষণ এবং বিষয় ও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য বিচার করে উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করা সম্ভব। এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় ও বিষয়-আঙ্গিক বিচার সময় ও সমাজের চরিত্র ও রুচি অনুসারী। যেমন আয়তন, চরিত্র এবং ঘটনা-বৈশিষ্ট্য বিচারে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'ওল্ডম্যান এন্ড দ্য সী' এবং লিউ তলস্তয়ের 'ওয়ার এন্ড পীস' দুই ভিন্ন স্বভাবের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত। হারমান মেলাভিলের 'মবিডিক' এবং জেমস্ জয়েসের 'ইউলিসিস', কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুন্ডলা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্‌র 'চাঁদের অমাবস্যা', এবং শহীদুলা কায়সারের 'সংশপ্তক' আয়তন, চরিত্রায়ন এবং বিষয়বিচারে ভিন্নধর্মী সৃষ্টি। কিন্তু সবগুলোই উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত ও বিশেষিত। তবুও উক্ত গ্রন্থগুলোতে মৌলিক কিছু লক্ষণ বিদ্যমান, যার ভিত্তিতে ঐসব গ্রন্থ উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত।

উপর্যুক্ত ধারণার আলোকে উপন্যাসের একটি সাধারণ সংজ্ঞার্থ আমরা নির্ণয় করতে পারি। তাহলো, যে বর্ণনাত্মক রচনায় মানুষের বাস্তব জীবনকথা লেখকের জীবনসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অভিব্যক্ত হয়, তাকেই উপন্যাস বলে। ঘটনামূলক ও বর্ণনাধর্মী হওয়ায় গদ্যভাষাই উপন্যাসের প্রকাশবাহন। মানুষের জীবন জটিল, সূক্ষ্ম এবং বিচিত্র। জীবনবৈশিষ্ট্যের বহুমুখী রূপের প্রতিফলন ঘটায় প্রতিটি উপন্যাসের আয়তন ভিন্নধর্মী। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' এবং 'শেষের কবিতা' বিচার করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে, উপন্যাস কেবল কাহিনী কিংবা ঘটনামাত্র নয়। মানুষের জীবনে অসংখ্য ঘটনা ঘটে। কোনো ঘটনা যৌক্তিক শৃঙ্খলাযুক্ত আবার কোনোটার মধ্যে তা থাকেনা। এজন্যেই উপন্যাসবিধৃত ঘটনাংশের মধ্যে যৌক্তিক শৃঙ্খলা থাকতে হবে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্র ও ঘটনার সমন্বয়ে একটি উপন্যাস হয়ে উঠবে যথার্থ।

উপন্যাসের উপাদান ও গঠনকৌশল

উপন্যাসের উপাদানের সংখ্যা ৭। এর মধ্যে শরীরী উপাদানের (Concrete elements) সংখ্যা-৬। যেমন, প্লট (plot), চরিত্র (Character), দৃষ্টিকোণ (Point of view), পশ্চাৎপট (Back ground), সময় (Time), এবং ভাষা (Language)। উপন্যাস বিশেষণে অশরীরী উপাদান (Abstruct elements) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে লেখকের জীবন সম্পর্কিত দর্শনকে।

প্লট

ইংরেজি সাহিত্যে উপন্যাস রচনার প্রথম দিকে গ্রীক সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সমালোচক অ্যারিস্টটলের প্লটসম্পর্কিত ধারণার প্রভাবই ছিলো সর্বাধিক। অ্যারিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থে প্লটের আলোচনায় বলেছেন — একটি মাত্র কর্মের সমগ্র রূপ অনুকৃত হয় প্লটে। বিভিন্ন অংশের মধ্যে গঠনগত ঐক্য এমনভাবে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করা হয়, যার ফলে একটি অংশকে তার ভেতর থেকে স্থানান্তরিত করলে প্লটের সমগ্র গঠনটিই ভেঙে পড়বে (So the plot being an imitation of an action, must imitate one action and that a whole, the structural vision of the parts being such that, if

any one of them in displaced or removed, the whole will be disjoined and disturbed)। অ্যারিস্টটলের মতে প্লট একটি সমগ্র ও সম্পর্ক 'কর্ম' (Action), অন্যত্র তিনি বলেছেন, প্লট হচ্ছে ঘটনাবলীর বিন্যাস (Arrangement of incidents) এবং এই ঘটনাবিন্যাসে আদি, মধ্য এবং অন্তের মধ্যে থাকবে ঐক্য। তিনি প্লটকে সরল (Simple) ও জটিল (Complex) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। তাঁর জটিল প্লটের ধারণা প্লটভাবনার পরবর্তী রূপান্তরের সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করেছিলো।

আজকের বিচারে হয়তো অ্যারিস্টটলের ধারণার মধ্যে অপূর্ণতা লক্ষ করা যাবে, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত এই ধারণাকেই উপন্যাসের তাত্ত্বিক এবং তত্ত্বচেতন ঔপনাসিকরা বহুলাংশে গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম যুগের ঔপন্যাসিকরা যেমন, রিচার্ডসন এবং হেনরি ফিলডিং Plot এবং Story (কাহিনী)-কে অভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা কাহিনীকে একটি ঐক্যবদ্ধ রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্লট ধারণারও পরিবর্তন ঘটে। উপন্যাসবিধৃত কর্ম বা Action যে মানব চরিত্রের রূপায়ণ এ-সত্যটি সুস্পষ্ট হতে থাকে। ঘটনা, চরিত্র, চরিত্রের চিন্তা, অনুভূতি, তার জীবনসম্পর্কিত তত্ত্ব বা দর্শনও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। হেনরি জেমস তাঁর The Art of Fiction (১৮৮৪) প্রবন্ধে প্লট এবং কাহিনীর সঙ্গে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য সন্ধান করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে এসে উপন্যাসের প্লটভাবনায় সময়ের গুরুত্ব স্বীকৃত হলো। মানবজীবনে সংঘটিত ঘটনা যে আসলে সময়েরই বহিঃপ্রকাশ — এই বোধ থেকে প্লটকে বলা হলো কার্যকারণ শৃঙ্খলাযুক্ত সময়। এই সময়ের বহমানতা বাহ্যিক দৃষ্টিতে এক রকম আর চিন্তা, অনুভূতি, স্মৃতি-স্বপ্ন-কল্পনার মানদন্ডে এক রকম। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্লটকে ঘটনার পারম্পর্য হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাস প্লটবিন্যাসের নির্ভুল দৃষ্টান্ত। ঐতিহাসিক ঘটনার রূপায়নেও 'রাজসিংহ' কিংবা 'আনন্দমঠ'-এ প্লটবিন্যাসের প্রচলিত রীতির অনুসারী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম প্লটকে সময় ও চেতনার ঐক্যে সুগ্রথিত করলেন। তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের প্লট কাহিনী (Story) কিংবা 'ঘটনা'র (Events) পারম্পর্য শৃঙ্খলাযুক্ত বিন্যাসমাত্র নয়, আধুনিক শিক্ষিত মানব-মানবীর চেতনা, অনুভূতি, কল্পনা ও দর্শনের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমও ঘটে।

চরিত্র

উপন্যাসের শরীরী উপাদানসমূহের মধ্যে চরিত্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। কেননা, উপন্যাস মানুষের সৃষ্টি এবং অন্তর-বাহির সমেত মানব-মানবীর সমগ্র জীবনের রূপায়ণের প্রয়োজনবোধই উপন্যাসের জন্মকে সম্ভব করে তুলেছিলো। অ্যারিস্টটল চরিত্র অপেক্ষা প্লটকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ট্র্যাজেডির গঠনবৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ছয়টি অংশ প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন, প্লট, চরিত্র , ভাষা, ভাবনা (Thought), দৃশ্য এবং সঙ্গীত। প্রথমে তিনি প্লটের আলোচনা করেছেন। অতঃপর চরিত্রের । কিন্তু পট যে জীবনের কাজের অনুকরণ, তা নিঃসন্দেহে মানুষের। অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টান্তের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অ্যারিস্টটল চরিত্রের প্রকৃত ক্ষেত্রটি নির্দেশ করতে পেরেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকরা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খ বর্ণনাকে (Narration) অধিক গুরুত্ব দিতেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের অনেক উপন্যাসেও বর্ণনাবাহুল্য চোখে পড়ে। কিন্তু বর্ণনার মধ্য দিয়ে চরিত্রের বাইরের অবয়ব, গতিবিধি, দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলিই উপস্থাপন করা যায়। চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনের জন্যে বর্ণনার অতিরিক্ত আরো কিছু প্রয়োজন। জর্জ মেরিডিথ এই ভাবনা থেকেই সম্ভবত বলেছিলেন: 'কেবল চোখের পাতায় রঙ দিলেই চলবে না, চোখের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিও ফোটাতে হবে।' ফরাসি বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লবোত্তর কালে মানুষের ব্যক্তিসত্তার গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসেও চরিত্রের অবস্থান দৃঢ়তর হতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে চরিত্রের রূপায়ণ মূলত বর্ণনাধর্মী। চরিত্রের ক্রিয়াশীলতা সমাজ, উপন্যাসবিধৃত ঘটনা এবং ঔপন্যাসিকের আদর্শবোধের কাছে দায়বদ্ধ। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে আয়েষা চরিত্র সম্পর্কে লেখকের উক্তি: 'যেমন উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনি আয়েষা।' অর্থাৎ পুরো উপন্যাসে আয়েষা ঘটনার প্রয়োজনে উপস্থাপিত। আপন ব্যক্তিত্ব ও কর্মধারায় সে স্বাবলম্বী নয়। ই.এম. ফরস্টার এ-ধরনের চরিত্রকে বলেছেন Flat Character বা সমতল চরিত্র। এ-ধরনের চরিত্র উপন্যাসের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। ঘটনাধারার সঙ্গে অক্রিয় (Passive) অবস্থান করে মাত্র। কিন্তু যে চরিত্র উপন্যাসের শুরু থেকেই আকৃতি-প্রকৃতিসহ উপস্থাপিত হয় এবং তার ভবিষ্যৎ গতিবিধি, প্রাধান্য, মনোজাগতিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতসহ ক্রিয়াশীল থাকে, তাকে বলা হয় Round Character বা নিটোল চরিত্র। 'চোখের বালি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনী চরিত্রকে গোড়া থেকেই তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা চিত্রিত করেছেন। ফলে, চরিত্রটি হয়ে উঠেছে সমগ্র।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের চরিত্রায়নকে এ-প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। শচীশ, জগমোহন, দামিনী এবং শ্রীবিলাস — এই চারটি চরিত্রের রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। শ্রীবিলাস সমতল চরিত্র (Flat Character)। তার চরিত্রের বিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত উপন্যাসে নেই — আগাগোড়া একই রকম। তার মানসিক পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত বা প্রাসঙ্গিকতা উপন্যাসে নেই। শচীশ এবং দামিনীর স্বভাবধর্ম ও বিবর্তনের ইঙ্গিত গোড়া থেকেই সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসের চরিত্রায়নে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। 'চোখের বালি'র বিনোদিনী, 'গোরা' উপন্যাসের গোরা, 'যোগাযোগে'র কুমুদিনী, 'শেষের কবিতা'র অমিত ও লাবণ্য তীক্ষ্ম রেখায় চিত্রিত এবং ব্যঞ্জনাগর্ভ। 'চতুরঙ্গে' শচীশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য চরিত্রটির সমগ্র স্বরূপ উন্মোচন করে। যেমন,

> 'শচীশ দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক তার চোখে জ্বলিতেছে। তার সরু সরু লম্বা আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা, তার গায়ের রং যেন রং নহে, তা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিলাম।'

দামিনী সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। যেমন,

> 'দামিনী যেন শ্রাবণ মেঘের ভিতরকার কামিনী'। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ, অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক-মিক করিয়া উঠিতেছে।'

শচীশ এবং দামিনীর বহিরাবয়বের সঙ্গে তাদের অন্তরজগৎও এভাবে উন্মোচিত হয়েছে। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে অমিত রায় এবং লাবণ্য চরিত্রের রূপ, স্বরূপ এবং পরিণতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে রেখায়িত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

১. অমিতর নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য-বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে। পাঁচজনের মধ্যে এ যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম। ... দাঁড়িগোফ-কামানো চাঁচা মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তি ভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না; মনটা এমন এক রকমের চকমকি যে ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে।

২. বাপের একমাত্র শখ ছিল বিদ্যায়, মেয়েটির মধ্যে তাঁর সেই শখটির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়েছিল। নিজের লাইব্রেরির চেয়েও তাকে ভালোবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, জ্ঞানের চর্চায় যার মনটা নিরেট হয়ে ওঠে সেখানে উড়ো ভাবনার গ্যাস নিচে থেকে ঠেলে ওঠার মতো সমস্ত ফাটল মরে যায়। সে মানুষের পক্ষে বিয়ে করবার দরকার হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁর মেয়ের মনে স্বামীসেবা-আবাদের যোগ্য যে নরম জমিটুকু বাকি থাকতে পারত সেটা গণিতে ইতিহাসে সিমেন্ট করে গাঁথা হয়েছে — খুব মজবুত পাকা মন যাকে বলা যেতে পারে — বাইরে থেকে আঁচর লাগলে দাগ পড়ে না।

উপন্যাসে চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির বহুল পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু জীবনের যে কোনো সত্যের উন্মোচনে চরিত্রের অনিবার্যতা অক্ষুণ্ণই রয়ে গেছে।

উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ (Point of view)

বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য উপন্যাসতাত্ত্বিকদের মতে দৃষ্টিকোণই হলো উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা কার্যকর উপাদান। ঘটনাংশ, চরিত্র কিংবা অন্যান্য উপাদানের উপস্থাপন কৌশল নির্ভর করে দৃষ্টিকোণের ওপর। ঔপন্যাসিকের জীবনকে দেখা এবং দেখানোর পদ্ধতি দৃষ্টিকোণই নির্ধারণ করে দেয়। উপন্যাস রচনার প্রথম পর্যায়ে ঘটনার যে বর্ণনাত্মক (Narrative) উপস্থাপন লক্ষ করি, সেখানে সমস্ত ঘটনা, চরিত্রের গতিপ্রকৃতি ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ লেখক স্বয়ং বিধৃত করতেন। অতঃপর উপন্যাসে মানবচরিত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর প্রধানত কেন্দ্রীয় চরিত্রের দৃষ্টিকোণের প্রয়োগ ঘটতে থাকে। স্মৃতিমূলক কিংবা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে মুখ্য-চরিত্র নিজেই নিজের কথা বিধৃত করে। সমগ্র ঘটনার ওপর লেখকের দৃষ্টির একক নিয়ন্ত্রণ কিংবা মুখ্য চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ছাড়াও তৃতীয় কোন চরিত্রও ঘটনা বর্ণনা করতে পারে উপন্যাসে।

উপন্যাসবিধৃত ঘটনা যখন লেখক নিরাসক্তভাবে প্রত্যক্ষ করে বিবৃত করেন, তখন বলা হয় লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ (Author`s Omnscient point of view)। মুখ্য চরিত্র কিংবা নায়কের জবানিতে যখন ঘটনা বিবৃত হয়, তখন তাকে অভিহিত করা হয় উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ হিসেবে (First person`s point of view)। ঘটনার প্রান্তে অবস্থানকারী কোনো চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হলে বলা হয়, প্রান্তিক চরিত্রের দৃষ্টিকোণ (Peripherid character)। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন প্রখ্যাত উপন্যাসতত্ত্ববিদ পার্সি লুবক তাঁর Craft of Fiction (১৯২১) গ্রন্থে দৃষ্টিকোণের অনিবার্যতা প্রথম সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করলেন। তাঁর মতে, উপন্যাসশিল্পের যাত্রা সেদিন থেকেই কার্যকরভাবে সূচিত হলো, যেদিন

ঔপন্যাসিক ভাবতে আরম্ভ করলেন যে, 'তাঁর গল্প এমন একটি বিষয় যাকে ঘটমান অবস্থায় দেখাতে হবে এবং এমনভাবে দেখাতে হবে যেন গল্পটি নিজেই নিজের কথা বলছে। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক নিজে গল্পটির বিবরণ দিলে সেটা উপন্যাসের সার্থক শিল্পকলা হল না। ঘটনাবলি এবং চরিত্রগুলা যেন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে নিজেদের কথা বলে ও কাজও করে গল্পটিকে ফুটিয়ে তুলবে। বলা (Telling) নয়, দেখানোই (Showing) হলো উপন্যাসের নিজস্ব শিল্পরীতি।' লুবকের মতে দৃষ্টিকোণই হলো উপন্যাসের শিল্পরীতির সবচেয়ে জটিল বিষয়। পার্সি লুবকের পরে ই.এম.ফরস্টার, জে. ডবিউ. বীচ, মার্ক স্কোরার, নরম্যান ফ্রায়াডম্যান প্রমুখ উপন্যাসতত্ত্ববিদ দৃষ্টিকোণের তাৎপর্যকে উপন্যাসবিচারের কেন্দ্রে স্থাপন করলেন।

কোনো উপন্যাস গভীরভাবে অনুধাবন করতে গেলে লেখকের দৃষ্টিকোণের স্বরূপ বুঝতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র 'রজনী' ছাড়া সকল উপন্যাসই সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিধৃত হয়েছে। রজনী'তে মুখ্য-চরিত্রের দৃষ্টিকোণের প্রয়োগ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন। তাঁর 'চোখের বালি' এবং 'গোরা' সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে একাধিক চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ, সন্দীপ এবং বিমলার দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের ফলে উপন্যাসশিল্পে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। 'শেষের কবিতা'য় লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হলেও চরিত্রসমূহের (বিশেষ করে অমিত ও লাবণ্য) অন্তর্লোক উন্মোচনের প্রয়োজনে তাদের দৃষ্টিকোণকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
রবীন্দ্র পরবর্তীকালে দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। দৃষ্টিকোণ প্রয়োগের কৌশল উপন্যাস বিচারে অন্যতম প্রধান মানদন্ডে পরিণত হয়েছে।

পশ্চাৎপট (Background)

উপন্যাসবিধৃত প্রতিটি ঘটনা এবং চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি স্থান বা পটভূমিগত ভিত্তি থাকে। কোনো ঘটনা কিংবা কাজ নিরবলম্ব বা শূন্য থেকে ঘটে না। এজন্যেই ঘটনা বা বিষয়ের একটি পশ্চাৎপট অনিবার্য হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উইলিয়াম থ্যাকারে, চার্লস ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট পশ্চাৎপটকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করলেন। ডিকেন্স চরিত্র ও ঘটনার প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্থান বা পশ্চাৎপটের বর্ণনা দিয়েছেন। জর্জ এলিয়টের কাছে পশ্চাৎপটের উপস্থিতি চরিত্র অঙ্কনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।
বিংশ শতাব্দীতে এই ধারণাটির ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কেউ কেউ পশ্চাৎপটকে স্বতন্ত্রভাবে মূল্য দিতে চেয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসের অন্য সব উপাদানের সঙ্গে সমন্বিত হয়েই পশ্চাৎপট বা স্থানের সার্থকতা। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের স্থান বা পশ্চাৎপট নাগরিক কোলাহল থেকে দূরবর্তী। উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলোর অন্তর্জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপস্থাপনে শিলং পাহাড়ের নির্জন পরিবেশের ভূমিকাকে রবীন্দ্রনাথ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

সময়

অ্যারিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থে ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় যে ত্রি-ঐক্যনীতির কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে কালের বা সময়ের ঐক্যের কথাও ছিলো। তবে তাঁর কাছে ক্রিয়াগত ঐক্যই (Unity of action) সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিলো। তার পরে এসেছে স্থান (Unity of place) ও কালগত ঐক্যের (Unity of time) প্রসঙ্গ। উপন্যাস রচনার প্রথম যুগ থেকেই সময়ের তাৎপর্য লেখকের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে। স্যামুয়েল রিচার্ডসন 'ক্লারিসা' উপন্যাসে পত্রলিখন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গিয়ে সময়ের ক্রমধারাকে সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। হেনরি ফিল্ডিং-এর 'টম জোনস' উপন্যাসেও সময়ের ক্রম অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু এঁরা সময়কে উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করেননি। ঘটনাক্রম রক্ষার ক্ষেত্রে সময়কে অনুসরণ করেছেন মাত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধব্যাপী উপন্যাসে সময়ের তাৎপর্য সচেতনভাবে স্বীকৃত হয়নি। হেনরি জেমসই প্রথম সময়কে উপন্যাসের গঠনগত ঐক্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেন। বালজাকের উপন্যাস আলোচনায় তিনি সময় রহস্যের স্বরূপ সন্ধান করেছেন। তিনি দুটি প্রসঙ্গে সময়ের গুরুত্ব অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন :

১. চরিত্র ও ঘটনাবলির সংক্ষেপীকরণের রহস্য ;

২. উপন্যাসের বিষয়বস্তুর স্থিতিকাল ও অতিক্রান্ত সময়ের প্রকাশ।

উপন্যাসে সময় নামক উপাদানকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে সময়ের ক্রিয়াশীলতাকে অনিবার্যতা দান করা তাঁর মতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি সময়রূপ উপাদানকে উপন্যাসের সাংগঠনিক ঐক্যসৃষ্টির (Organic Unity) কাজে ব্যবহৃত দেখতে চেয়েছেন। বিংশ শতাব্দীতেই প্রকৃতপক্ষে সময়ের প্রাসঙ্গিকতা উপন্যাসে গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়। প্রুস্ত, ডরোথি রিচার্ডসন ও জেমস জয়েসের মতো ঔপন্যাসিকরা সময়ধারণাকে উপন্যাসতত্ত্বের কেন্দ্রে স্থাপন করলেন।

মানবমনের জটিল সত্য, তার স্বপ্নলোক, চেতন-অচেতনের জটিল প্রান্তসমূহ সময়ের মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োগের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলো এবং দুই বিশ্বযুদ্ধের পর সময় বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসে ব্যবহৃত হতে থাকে । পাঠক, লেখক, বিষয়বস্তু, বর্ণনাপদ্ধতি, দৃষ্টিকোণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে সময়ের প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্য সাম্প্রতিক উপন্যাসবিচারের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ প্রসঙ্গ।

উপন্যাসের ভাষা ও পরিচর্যারীতি

জন্মলগ্ন থেকেই যে উপাদানের কারণে উপন্যাস অন্যান্য সাহিত্যরূপ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠলো, সে হলো তার ভাষা। কাহিনী, গল্প, চরিত্র প্রভৃতি উপাদানগুলো ট্র্যাজেডি কিংবা মহাকাব্যের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু জীবনের বাস্তবমুখী, কৃত্রিম, জটিল ও বহুকৌণিক রূপ অঙ্কনের প্রয়োজনে গদ্যভাষা হলো উপন্যাসের প্রকাশমাধ্যম। লেখকের জীবনদৃষ্টি ও জীবনসৃষ্টির সঙ্গে ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উপন্যাসের বর্ণনা (Narration), পরিচর্যা (Treatment), স্থান বা পশ্চাৎপট উপস্থাপন, চরিত্রের রূপ ও স্বরূপ নির্ণয়ে অনিবার্য ভাষারীতির প্রয়োগ যে কোনো ঔপন্যাসিকের কাম্য। উপন্যাসবিধৃত বিষয়ের সঙ্গে ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষার মাধ্যমেই কোনো উপন্যাস যথার্থ ও সমগ্র হয়ে ওঠে। এই ভাষাই একটি উপন্যাস থেকে আরেকটি উপন্যাসকে, একজন লেখক থেকে আরেকজন লেখককে পৃথক করে দেয়। অন্তর্ময় জীবনধর্মে পরিপুষ্ট কবিপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ এবং বুদ্ধদেব বসুই যে উপন্যাস-কাহিনীর শ্রেষ্ঠ কথক তা বলা যাবেনা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্‌র রুক্ষ কঠোর গদ্যও উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষা। এই ভাষা ব্যবহারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গতিশীলতার প্রমাণ বিচিত্র পরিচর্যারীতির উদ্ভাবন। উপন্যাসের বিষয়, চরিত্র ও স্থান ও সময়স্বভাবকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজন বোধ থেকেই বিচিত্র পরিচর্যারীতির উদ্ভাবন হয়েছে। এই সব পরিচর্যাকে বর্ণনাত্মক (Narrative), কাব্যানুগ (Poetic), নাট্যিক (Dramatic), চিত্রময় (Pictorial), প্রতীকী (Symbolic), বিশেষণাত্মক (Analytical) প্রভৃতি অভিধায় চিহ্নিত করা হয়েছে।

কেবলমাত্র বর্ণনা যে উপন্যাসের আকর্ষণকে গৌণ করে ফেলে ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম যুগের উপন্যাসসমূহ এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) তার প্রমাণ। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের রোমান্স সৃষ্টির প্রয়োজনে কাব্যানুগ পরিচর্যার সমান্তরালে নাট্যিক পরিচর্যা ব্যবহার করেছেন। পরিবেশ ও পরিস্থিতির স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়োজনে একটি উপন্যাসে সবগুলো পরিচর্যারীতি ব্যবহৃত হতে পারে। তবে উপন্যাসের বিষয়ের স্বভাব একটি প্রধান পরিচর্যারীতিকে একান্তভাবে গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' বিষয়ের অন্তর্ময়তার কারণেই প্রধানত বিশেষণধর্মী (Analytical), 'গোরা'র মহাকাব্যিক রূপকল্প বর্ণনাত্মক এবং 'শেষের কবিতা'র ভাবমুখ্য বিষয় কাব্যানুগ পরিচর্যায় উপস্থাপিত হয়েছে।

জীবনদর্শন, জীবনার্থ বা জীবনধারণা

উপন্যাসের অশরীরী উপাদান (Abstract Elements) হিসেবে জীবনদর্শনের তাৎপর্য বিশেষণ করলে অন্য সব শরীরী উপাদানকেও তা ছাড়িয়ে যায়। লেখকের ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তি অনুভূতি এবং জীবন, সময় ও সমাজসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির অন্তঃসারকে আত্মস্থ করে গড়ে ওঠে লেখকের জীবনদর্শন বা জীবনার্থ। ঔপন্যাসিক যখন উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন, তখন তিনি যে কেবল সাধারণভাবে একটি আদর্শ নৈর্ব্যক্তিক মানুষ রচনা করেন তা নয়, তিনি আপন সত্তারই একটি ভাষ্য (Implied Version) রচনা করেন। সত্তার অন্তর্নিহিত এই ভাষ্য অন্য সাহিত্যরূপ গুলোতে থাকলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তার মূল্য স্বতন্ত্র। ঔপন্যাসিকের অন্তর্নিহিত এই লেখকসত্তাকে 'দ্বিতীয় সত্তা' হিসেবেও অভিহিত করা হয়েছে। একজন লেখকের প্রতিটি উপন্যাসে এই লেখক-সত্তার প্রকাশ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ পায়। শরীরী উপাদানগুলোর যৌথ ব্যবহারের অনিবার্যতার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মূলত তাঁর জীবনসম্পর্কিত তত্ত্ব বা দর্শনকেই প্রকাশ করেন। উপন্যাস রচনার প্রথমযুগে বর্ণনার (Narration) প্রতি অতি মনোযোগের ফলে অন্যান্য শরীরী উপাদানের মতো জীবনদর্শনের প্রশ্নটিও অনুচ্ছারিত থেকে যেত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পৃথিবীর সব ভাষার উপন্যাসে লেখকের জীবনদর্শনের প্রকাশ তীব্রতর হতে থাকে। কেউ ইতিহাস, কেউ সমকালীন সময় ও সমাজ, আবার কেউ কেউ ব্যক্তির কর্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়ে এই দর্শনকে প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রায় উপন্যাসেই জীবনসম্পর্কিত একটা বক্তব্য আছে। কিন্তু দু-একটি উপন্যাস বাদে অন্য সব উপাদানের সমন্বয়ে তা যথার্থ হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের বিশ্বজনীনতার তত্ত্বটি আমাদের জানা। এ উপন্যাসে ঘটনা, অপরাপর চরিত্র এবং সমাজজীবনের বিস্তৃত পরিসরকে কেন্দ্র করে গোরা চরিত্রের মানসবৈচিত্র্য ও উত্তরণ দেখানো হয়েছে। গোরার উত্তরণ বা মীমাংসায় উন্নীত হওয়ার মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনসম্পর্কিত দর্শন প্রকাশ করেছেন। 'শেষের কবিতা' রীতির দিক থেকে কাব্যধর্মী হলেও প্রেমের চিরন্তনতার যে তত্ত্ব এ-উপন্যাসের শেষে উচ্চারিত হয়েছে, তা আসলে রবীন্দ্রনাথেরই জীবনদর্শন। এ-ভাবেই আধুনিক উপন্যাসে জীবনদর্শনের অনিবার্যতা স্বীকৃত হয়েছে।

উপন্যাসের শ্রেণীকরণ

শরীরী উপাদানসমূহের প্রাধান্যের ভিত্তিতে উপন্যাসকে ঘটনা প্রধান, ভাবনাপ্রধান, বর্ণনা প্রধান, চরিত্র প্রধান প্রভৃতি অভিধায় চিহ্নিত করা যায়। তবে উপন্যাসে ঘটনা বা ও চরিত্রের ভূমিকাই মুখ্য।
ঘটনাপ্রধান উপন্যাসকে প্রধানত পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

১. সামাজিক উপন্যাস
২. ঐতিহাসিক উপন্যাস
৩. পৌরাণিক উপন্যাস
৪. আঞ্চলিক উপন্যাস
৫. আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস

১. সামাজিক উপন্যাস

সমাজ-জীবনের ঘটনা নিয়ে রচিত উপন্যাসকে বলে সামাজিক উপন্যাস। মানুষ সামাজিক জীব — আবার ব্যক্তিও বটে। তার সামাজিক ক্রিয়াকর্মকে প্রাধান্য দেয়া হয় সামাজিক উপন্যাসে। পরিবার, দেশ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি সমাজ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। সামাজিক উপন্যাসে এ সকল বিষয় প্রাধান্য পায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যোগাযোগ', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পলীসমাজ', বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর', সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্‌র 'লালসালু' সামাজিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত।

২. ঐতিহাসিক উপন্যাস

ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্র নিয়ে রচিত উপন্যাসকে বলা হয় ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাস গ্রন্থের সঙ্গে এর পার্থক্য হলো ইতিহাসে কেবল সংঘটিত ঘটনার বিবরণ ও মূল্যায়ন থাকে আর ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বন করে ঔপন্যাসিক তাঁর জীবনবোধকে প্রকাশ করেন। তবে কল্পনার বিস্তারের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিককে সতর্ক থাকতে হয় — যাতে ইতিহাসের বিকৃতি না ঘটে। জাতীয় ইতিহাসের গৌরব, জয়-পরাজয়, আনন্দ-বেদনা, ঐতিহ্যের উৎস নতুন তাৎপর্য নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়। লিও তলস্তয়ের 'ওয়ার এন্ড পীস', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত।

৩. পৌরাণিক উপন্যাস

পুরাণের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে রচিত উপন্যাসকে পৌরাণিক উপন্যাস বলে। প্রাচীন কালের মানুষের ধর্ম, বিশ্বাস এবং সংস্কারকেই আমরা পুরাণ-বলে জানি। প্রাচীন মানুষের জীবনে পুরাণের প্রভাব ছিল অপরিসীম। আধুনিক ঔপন্যাসিক পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করেন নিজের দেশ, সমাজ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে। সত্যের সেনের 'অভিশপ্ত নগরী' পৌরাণিক উপন্যাসের দৃষ্টন্ত।

৪. আঞ্চলিক উপন্যাস

যে উপন্যাসে বিশেষ কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশে মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এবং জীবন যাপনের স্বাতন্ত্র্য-রূপ প্রকাশ পায়, তাকেই বলে আঞ্চলিক উপন্যাস। শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস বিশেষ অঞ্চলের কাহিনী হয়েও মানবিক গুণাবলী প্রকাশে সর্বজনীনতা লাভ করে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', অদ্বৈত মলবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত।

৫. আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস

গঠনকৌশলের দিক থেকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস কাহিনী প্রধান নয়, চরিত্রপ্রধান। নিজের জীবনের ঘটনাকে যখন বিশেষ সমাজ ও দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে ঔপন্যাসিক উপস্থাপন করেন তখন জন্ম নেয় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এদিক থেকে বিচার করলে প্রতিটি মহৎ উপন্যাসেই ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি-জীবন ও ব্যক্তিচিন্তার প্রতিফলন ঘটে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পঁচালী'কে আমরা আত্মজীবনীমূলক সামাজিক উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি।

এছাড়াও গঠনকৌশল ও জীবনবিন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে উপন্যাস আরো বিচিত্র শ্রেণীর হতে পারে। যেমন **ক.** কাব্যধর্মী উপন্যাস **খ.** ভ্রমণ উপন্যাস **গ.** পত্রোপন্যাস **ঘ.** মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস **ঙ.** চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস **চ.** রহস্য উপন্যাস **ছ.** প্রতীকী উপন্যাস **জ.** মহাকাব্যিক উপন্যাস ইত্যাদি।

জীবনবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যর দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' কাব্যধর্মী উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে। এ উপন্যাসকে ভাবনাপ্রধান উপন্যাসও (Novel of thought) বলা যেতে পারে।

উপন্যাসের ইতিহাস

ইউরোপে বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যের উপন্যাস-যুগের সূচনা দানিয়েল ডিফো'র ' রবিনসন ক্রুশো'র (১৭১৯) কাল থেকে । অধিকাংশ সমালোচকের মতে ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস স্যামুয়েল রিচার্ডসনের 'পামেলা' (১৭৪০)। 'রবিনসন ক্রুশো' মূলত ভ্রমণকাহিনী আর 'পামেলা' ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে পরিবার ও সমাজের পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম যুগের কয়েকজন ঔপন্যাসিক হলেন হেনরি ফিল্‌ডিং (১৭০৭-১৭৫৪), স্যামুয়েল রিচার্ডসন (১৬৮৯-১৭৬১) এবং ওয়াল্টার স্কট (১৭৮১-১৮৩২)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপে ও আমেরিকায় উপন্যাসের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। জর্জ এলিয়ট (১৮১৯-১৮৮০), চার্লস ডিকেন্‌স (১৮২২-১৮৭০), হেনরি জেমস (১৮৪৩-১৯১৬) উপন্যাসের প্রথম যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। রুশ সাহিত্যের লিও তলস্তয়ের নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

ইংরেজ সাহিত্যের প্রথম যুগের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হলো হেনরি ফিল্‌ডিং-এর 'টম জোনস্', জেন অস্টেনের 'প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস', চার্লস ডিকেনস্-এর 'ডেভিড কপারফিল্ড' এবং এমলি ব্রন্টির 'উইদারিং হাইটস্'। ফরাসি সাহিত্যে গুস্তাৎ ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারি', রুশ সাহিত্যে ফিওদর দস্তয়েভস্কির 'দি ব্রাদার্স কারমাজোভ', লিও তলস্তয়ের 'ওয়ার এন্ড পীস' এবং 'আনা কারেনিনা', আমেরিকান সাহিত্যে হেনরি জেমস-এর 'দি পোর্টেট অব এ লেডি' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের দৃষ্টান্ত।

বিশ শতাব্দীতে উপন্যাসের বিষয় ও গঠন-কৌশল নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্য করা যায়। সমার-সেট মম, ডি.এইচ. লরেন্স, ভার্জিনিয়া উলফ, জেমস জয়েস, জ্যাঁ পল সার্তে, স্যামুয়েল বেকেট প্রমুখ ঔপন্যাসিক নতুন নতুন ধারায় উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জীবন-যাপন, ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের বিষযবস্তুর যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি উপস্থাপন ভঙ্গিতেও নতুন নতুন রীতি প্রবর্তিত হয়েছে।

বাংলা উপন্যাস

আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রথম সার্থক উপন্যাস। এরপর বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'রাজসিংহ' (১৮৮২) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি দান করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-'৯১) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথের সাধনায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মতো উপন্যাসও সমৃদ্ধ হয়েছে। ঘটনা,গঠন-কৌশল, জীবনদর্শন ও ভাষার ঐশ্বর্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি উপন্যাসই বিশিষ্ট। 'চোখের বালি' (১৯০৩) 'গোরা' (১৯১০),'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৯), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'চার অধ্যায়' (১৯৩০) রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর মধ্যে অন্যতম।

রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'শ্রীকান্ত' (১৯১৭-৩৩),'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'দেনাপাওনা' (১৯২৩), 'পথের দাবী' (১৯২৬) প্রভৃতি উলেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের বৈচিত্র্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয়বস্তু, গঠনকৌশল, জীবনকে দেখা এবং দেখানোর ভঙ্গি প্রভৃতি দিক থেকে এ সময়ের প্রত্যক ঔপন্যাসিকই বিশিষ্ট। এঁদের মধ্যে উলেখযোগ্য হলেন : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), জগদীশ গুপ্ত (১৮৬৬-১৯৫৬), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৮৮), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯),

প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-৮০) কমলকুমার মজুমদার (১৯১৫-১৯৭৯) সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫) এবং সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)।

বাংলাদেশের উপন্যাস

অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের উপন্যাস কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের সহচর হয়েও স্বতন্ত্র ধারায় বিকাশ লাভ করেছে। এর কারণ বাংলাদেশের নদীমাতৃক, কৃষিনির্ভর জীবন এবং শিল্প-রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের সময় বাংলাদেশ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্ন্তভুক্ত হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। তবে এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠির স্বতন্ত্র জীবনধারার মতো উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। এই ধারার প্রথম উপন্যাস মোহাম্মদ নজিবর রহমানের (১৮৬০-১৯২৩) 'আনোয়ারা' (১৯১৪)। কাজী আব্দুল ওদুদের 'নদীবক্ষে' (১৯১৯), বেগম রোকেয়ার 'অবরোধবাসিনী' (১৯২৮), কাজী ইমদাদুল হকের 'আব্দুল্লাহ' (১৯৩৩), হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী' (১৯৪৫) বাংলাদেশের উপন্যাসের পটভুমি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশে রচিত উপন্যাস বিষয়বস্তু ও গঠন-কৌশলের নতুন নতুন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে। প্রধানত গ্রামীণ কৃষিজীবন, নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন, আঞ্চলিক উপাদান সমৃদ্ধ জীবন বাংলাদেশের উপন্যাসের প্রধান বিষয়। এছাড়া দেশের মানুষের রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ বাংলাদেশের উপন্যাসের কাহিনী রূপে গৃহীত হচ্ছে। বিশেষত ভাষা আন্দোলন ও আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ কিছু উপন্যাসে বিষয় রূপে গৃহীত হওয়ায় জাতীয় গৌরবের স্মারক হিসেবে সে-সব উপন্যাস আমাদের সাহিত্যের অহংকার।

বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁরা কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: আবুল মনসুর আহমেদ (১৮৯৭-১৯৯৭), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১), কাজী আফসার উদ্দিন (১৯২১ —), আবু জাফর শামসুদ্দিন (১৯১১-১৯৮৮), শওকত ওসমান (১৯২১ — ১৯৯৮), আবু রুশদ (১৯১৯ —), সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্ (১৯২২-১৯৭১), আবদুর রাজ্জাক (১৯২৬-১৯৮১), সরদার জয়েন উদ্‌দীন (১৯২৩-১৯৮৬) , রশীদ করিম (১৯২৫ —), শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬ —), আবু ইসহাক ১৯২৬ —), অদ্বৈত মলবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১), মিরজা আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৮৪), শহীদুলা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১),আলাউদ্দীন আল আজাদ (১৯৩২ —), জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫ —), শওকত আলী (১৯৩৬ —), হুমায়ুন কাদির (১৯৩৫-১৯৭৭), আবু বকর সিদ্দিক (১৯৩৬ —), রিজিয়া রহমান (১৯৪৩ —), মাহমুদুল হক (১৯৪০ —), রাহাত খান (১৯৪০ —), রশীদ হায়দার (১৯৪১ —), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭), সেলিনা হোসেন (১৯৪৭ —), হুমায়ন আহমেদ (১৯৪৮ —), কায়েস আহমেদ (১৯৪৮-১৯৯২), সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ দত্ত, ইমদাদুল হক মিলন (১৯৫৪ —), মঈনুল আহসান সাবের (১৯৫৮—)।

বস্তুসংক্ষেপ:

যে বর্ণনাত্মক রচনায় মানুষের বাস্তব জীবনকথা লেখকের জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অভিব্যক্ত হয়, তাকেই উপন্যাস বলে। ঘটনামূলক ও বর্ণনাধর্মী হওয়ায় গদ্যভাষাই উপন্যাসের প্রকাশবাহন। মানুষের জীবন জটিল, সূক্ষ্ম এবং বিচিত্র। জীবন বৈশিষ্ট্যের বহুমুখী রূপের প্রতিফলন ঘটার জন্য প্রতিটি উপন্যাসের আয়তন ভিন্নধর্মী।

জন্মলগ্ন থেকেই যে উপাদানের কারণে উপন্যাস অন্যান্য সহিত্যরূপ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে, তা হল তার ভাষা। কাহিনী, চরিত্র প্রভৃতি উপাদানগুলো ট্রাজেডি কিংবা মহাকাব্যের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু জীবনের বাস্তবমুখী, কৃত্রিম, জটিল ও বহুকৌণিক রূপ অঙ্কনের প্রয়োজনে গদ্যভাষা হল উপন্যাসের প্রকাশমাধ্যম। লেখকের জীবনদৃষ্টি ও জীবন সৃষ্টির ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উপন্যাসের বর্ণনা, পরিচর্যা, স্থান বা পশ্চাৎপট উপস্থাপন, চরিত্রের রূপ ও স্বরূপ নির্ণয়ে অনিবার্য ভাষারীতির প্রয়োগ যে কোন ঔপন্যাসিকের কাম্য। উপন্যাসবিধৃত বিষয়ের সঙ্গে ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষার মাধ্যমেই কোন উপন্যাস যথার্থ ও সমগ্র হয়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করুন।

২. উপন্যাসের অশরীরী উপাদানের স্বরূপ নির্দেশ করুন।

৩. উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ করুন এবং প্রধান প্রধান শ্রেণীর পরিচয় দিন।
৪. উপন্যাসের প্লট কাকে বলে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. উপন্যাসের শ্রেণীকরণ সম্পর্কে যা জানেন বিস্তারিত লিখুন।
২. উপন্যাসের প্লট ও চরিত্র বিষয়ে যা জানেন নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

১ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তর

উপন্যাসের শরীরী উপাদানগুলোর (Concrete Elements) ওপরই সমালোচকরা সব সময় গুরুত্ব আরোপ করেন। আখ্যানধর্মী সকল রচনাই (যেমন: মহাকাব্য, নাটক, বাংলা মঙ্গলকাব্যসমূহ) ঘটনা,চরিত্র, ভাষা প্রভৃতি উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। কিন্তু ঐ সব রচনায় আমরা জীবনদর্শনের সন্ধান করি না। উপন্যাসে বিধৃত লেখকের জীবনসম্পর্কিত বক্তব্যকেই তার অশরীরী উপাদান (Abstract Elements) হিসেবে অভিহিত করা হয় । ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তি অনুভূতি তাঁর জীবনসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়। এই নির্বস্তুক সত্যটি উপন্যাস অনুধাবনের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই জীবনদর্শন কখনো হয় ঘটনা-আশ্রয়ী, কখনো বা চরিত্র-আশ্রয়ী। 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেম বা নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্বকে চরিত্র ও ঘটনার সমন্বয়ে ব্যক্ত করেছেন। একই ধরনের ঘটনা বিভিন্ন লেখক উপন্যাসের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনই তাকে স্বতন্ত্র করে দেয়। এ অর্থে জীবনদর্শন বা Author's Philosophy of Life একটি উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান। উপন্যাসের পরিপূর্ণতার ধারণাটিও জীবনদর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

পাঠ-৬

নাটক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- নাটকের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করতে পারবেন।
- নাটকের গঠনকৌশল সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- নাটকের রূপগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- নাটকের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।
- নাটক সম্পর্কে নাট্যতত্ত্ববিদ এ্যারিস্টটলের ধারণা লিখতে পারবেন।
- বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখতে পারবেন।

সংজ্ঞার্থ

সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক বা রূপের (Form) মধ্যে নাটক কবিতার মতোই প্রাচীন। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে নাটককে কবিতারই একটি রূপ 'দৃশ্যকাব্য' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যেখানে কবিতাকে বলা হয়েছে 'শ্রব্যকাব্য'। নাটকে ঘটনা, চরিত্র, চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আচার-আচরণ উচ্চারিত সংলাপের মাধ্যমে রূপ লাভ করে। এ-ক্ষেত্রে নাটকের বিষয়বস্তু, পাত্র-পাত্রী এবং দর্শকের যৌথ উপস্থিতিতে এটি হয়ে ওঠে সামবায়িক শিল্প। অন্যদিকে কবিতা মূলত শ্রুতিনির্ভর। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যতাত্ত্বিক এ্যারিস্টটলের Poetics বা কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থে প্রধানত নাটকেরই বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে মানুষের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন নাটকের রূপ-রীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন অনিবার্য করে তুলেছে। কিন্তু নাটকের মৌলিক উপকরণ — অভিনেতা-অভিনেত্রী, মঞ্চ এবং দর্শক-শ্রোতা — অভিন্নই রয়ে গেছে।

মানুষের জীবন সরলরেখায় শান্ত-স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে প্রবাহিত হয় না। এ-ধরনের জীবন থাকলেও তা নাটকীয়তা বর্জিত। মানুষের জীবনের ছন্দ ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে প্রবহমান। দুর্ভোগ, যন্ত্রণা, বিক্ষোভ, অশান্তি প্রভৃতির আকস্মিক আঘাতে মানুষের জীবনে গতি ও বৈচিত্র্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। জীবনের এই গতি ও বৈচিত্র্যকে শিল্পে ধারণ করার প্রয়োজন থেকেই নাটকের উদ্ভব। মহৎ চেষ্টার নিষ্ফলতা, প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ব্যর্থতা, অপ্রত্যাশিত ভাগ্যবিপর্যয়, বিচিত্র ঘটনার চমকপ্রদ সমাপতন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতা, দ্বেষ-ঈর্ষা, কঠিন সংগ্রাম ও তার শোকাবহ পরাজয়, মনের গভীরে বিরুদ্ধ-প্রবৃত্তির সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম — এই সব নাটকীয় উপাদান বা নাটকীয়তা রয়ে গেছে মানুষের জীবন ও তার স্বভাবের মধ্যেই। নাট্যকার নাটক রচনার সময় জীবনের উলিখিত উপাদানগুলোই গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু উপাদানগুলোকে গ্রহণ করলেই যথার্থ নাটক হবে না। নির্দিষ্ট শিল্প-শৃঙ্খলায় কোনো একটি উপাদান বা একাধিক উপাদানের বিন্যাসই সার্থক নাটকের জন্ম দেয়। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটকেরও রয়েছে রূপ-রীতিগত নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা। কবিতা, গল্প, উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধ পাঠ ও উপভোগের জন্য মানুষের অন্য ব্যক্তি বা সহশক্তির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কেবল পাঠ করে নাটক উপভোগ করা যায় না। নাটক যথার্থভাবে উপভোগ করতে হলে একটি সামবায়িক বা যৌথ পরিবেশের প্রয়োজন। অভিনেতা-অভিনেত্রী, মঞ্চ এবং দর্শক-শ্রোতা — এসবের দিকে লক্ষ রেখেই নাট্যকার নাটক রচনা করেন। কেবল পাঠ করে নাটকের যে উপভোগ — তা আংশিক। উপভোগকে সমগ্র হয়ে উঠতে হলে নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে সম্মিলিতভাবে নাটক উপস্থাপন ও দর্শন করতে হয়। এ জন্যেই নাটকের শিল্পীরীতি যথেষ্ট সতর্ক, দৃঢ়বদ্ধ, কঠোর এবং নিয়মতান্ত্রিক। সময়ের বিবর্তনে নাটকের রূপ-রীতির ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু নিয়মের অনুশাসনের মধ্যে থেকেই রূপরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন নাট্যকাররা। প্রাচীন গ্রীক-রোমান নাটক, এলিজাবেথান যুগের কালজয়ী নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়রের নাটক কিংবা ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিচিত্র উপাদানে তৈরি নাটকসমূহ বিশেষণ করলে উপর্যুক্ত মন্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে। নিয়ম ও রূপরীতির অনুশাসনের ফলেই নাটকের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা হয়ে উঠেছে প্রায়োগিক শিল্পমাধ্যম বা Performing Art ।

নাটকের পট বা ঘটনাংশ

এ্যারিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থে নাটকের ছয়টি অঙ্গের কথা বলেছেন: ১. পট বা বৃত্ত ২. চরিত্র ৩. রচনারীতি ৪. ভাব, ৫. দৃশ্য এবং ৬. সঙ্গীত। এগুলোর মধ্যে পট বা বৃত্তই প্রধান। মানবজীবনে ঘটে যাওয়া বিচিত্র ঘটনার মধ্য থেকে নাট্যকার নাটকের উপাদান আহরণ করেন।

নাটকের ঘটনাংশ বিভিন্ন অঙ্কে বিভক্ত থাকে। বিভিন্ন অঙ্কে নাটকের গতি চরিত্রের ফর্ম বা অ্যাকশন অনুযায়ী গতি পায়। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে এই গতি চরম লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়। শেক্সপীয়রের নাটকের ঘটনাংশ পঞ্চাঙ্ক বিভাগের মাধ্যমে উপস্থাপিত। প্রত্যেক অঙ্কে ঘটনা এক-একটি বাঁক নেয়। এভাবে ঘটনার গতি উত্থান, চরমোন্নতি ও পতনের মধ্য দিয়ে পরিণামের দিকে ধাবিত হয়।

নাটকের Plot বা বৃত্তের বিন্যাস-কৌশলের উপরই নির্ভর করে নাটকের শিল্পসার্থকতা।

নাটকে পট বা বৃত্ত যে বিষয়বস্তুকে ধারণ করবে, এ্যারিস্টটলের মতে, সেখানে আদি, মধ্য, অন্ত — এই তিনটি পর্ব-বিভাজন থাকবে। তাঁর মতে নাটকের কাহিনী দুই রকম:

১. সরল (Simple)
২. জটিল (Complex)

যে-নাটকে ঘটনার ধারা অবিচ্ছিন্ন, তার পটকেই বলা হবে সরল। কিন্তু মানুষের জীবনে এই সরল রৈখিক অবিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়াও রয়েছে এক গভীর, জটিল পর্যায়। যে-সব নাটকের ঘটনার মধ্যে বিপর্যয় বা অভূতপূর্ব ধারণা, বোধ কিংবা ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক নতুন চিন্তার প্রতিফলনে বিশিষ্ট (Reversal of Situation or Recognition or by Both) হয়ে ওঠে, সে-সব নাটকের চরিত্র ভালো-মন্দ বা ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বাঁক পরিবর্তন করে। এই বাঁক পরিবর্তনে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা মানবিক অবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিস্থিতির বিপর্যয় নাটকের ঘটনাকে কতোটা জটিল করে তুলতে পারে, সফোক্লিসের কালজয়ী ট্র্যাজেডি 'ইডিপাস' তার প্রমাণ। নাটকের ঘটনার পরিণতি আনন্দদায়ক হলে তাকে বলে কমেডি (Comedy)। আবার চরম দুঃখবহ হলে তাকে বলা হয় ট্র্যাজেডি (Tragedy)। সফোক্লিস এবং শেক্সপীয়রের অধিকাংশ নাটকই পটবিন্যাস এবং বিষয়ভাবনায় ট্র্যাজেডির পর্যায়ে পড়ে।

সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের পট ও বিষয়বিন্যাসে প্রচুর রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু জীবনকে উপস্থাপনে সরল ও জটিল — এই দুই ভঙ্গির প্রাধান্য এখনো আছে। এ্যারিস্টটল সার্থক নাটকের জন্য তিনটি ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন। সে গুলো হচ্ছে — সময়ের ঐক্য, ঘটনার ঐক্য এবং স্থানের ঐক্য। এই ঐক্যের ধারণা অনেক পাল্টেছে বটে, কিন্তু সময়ের ভেতর-বাইরের শৃঙ্খলা এখনো একটি সার্থক নাটক হয়ে-উঠার অন্যতম মানদন্ড।

চরিত্র

নাটক মানব জীবনের রূপায়ণ। এ-জীবন ক্রিয়াশীল এবং বহুস্তরীভূত। সুতরাং চরিত্রই নাটকের মূল উপাদান। মানবচরিত্রের রূপ ও প্রকৃতি বিচিত্র, যেমন সৎ-অসৎ, সরল-জটিল, আত্মসচেতন, স্বাবলম্বী অথবা পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণকারী ইত্যাদি। মানবজীবন রূপায়ণের প্রয়োজনে যে কোন ধরনের চরিত্র নাট্যকার বেছে নিতে পারেন।

নাটকীয় চরিত্রকে চারটি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছেন এ্যারিস্টটল। তাঁর মতে নাটকীয় চরিত্র মূলত কতকগুলো নৈতিক আচরণের সমষ্টি বা প্রতিনিধি মাত্র। এ্যারিস্টটলের মতে, এই আচরণের ভিত্তিতেই নাটকের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে হবে।

প্রথমত: মানুষের চরিত্র ভালো (Good Character) হতে পারে। কিন্তু অবিমিশ্র ভালো চরিত্র নাটকে কোনো জটিলতা বা সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে না। নাটকীয় চরিত্র হবে ভালো-মন্দের সংমিশ্রণের ফল। এ্যারিস্টটলের মতে ট্রাজেডির চরিত্র হবে ভালো-মন্দের মাঝামাঝি।

দ্বিতীয়ত: নাটকে চরিত্রের যথাযথ প্রকাশ (Appropiateness) ঘটবে।

তৃতীয়ত: চরিত্রকে হতে হবে বাস্তবসম্মত (Real)

চতুর্থত: চরিত্রের সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ (Consistent)।

চরিত্রের আচরণে অসামঞ্জস্য থাকলে শিল্পের ক্ষেত্রে তা হবে সঙ্গতিহীন (Consistently Inconsistent)। এ্যারিস্টটলের এই দৃষ্টিভঙ্গি নাটকের চিরকালের বৈশিষ্ট্যকেই যেন নির্দেশ করেছে। সমাজজীবনের পরিবর্তন মানুষের বোধকেও পরিবর্তিত করেছে। ভালো মন্দের ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে। মন্দচরিত্রও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু মনুষ্যত্বের লক্ষণবর্জিত কোনো চরিত্র, যে মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণে ব্যর্থ — তাকে কখনোই নাটকীয় চরিত্র বলা যাবে না।

পরিবর্তনশীল সমাজ ও জীবন নাটকের চরিত্রের আকৃতি-প্রকৃতির বদলও অনিবার্য করে তুলেছে। ইউরোপের রেনেসাঁস থেকে শুরু করে গণতন্ত্রের আবির্ভাব ও চর্চা নাটকের চরিত্র ও তার স্বভাবকেও পরিবর্তন করেছে। রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের অন্ধকার যুগ থেকে কেবল নাটক নয়, নাটকের চরিত্রও বের হয়ে এসেছে। ইডিপাসের মতো অসাধারণ চরিত্র হয়তো এখন নেই। কিন্তু সাধারণ মানবজীবন থেকে আহৃত চরিত্র-পাত্রদের জীবনেও যে জটিল চিন্তা, তীক্ষ জিজ্ঞাসা, দ্বন্দ্ব, অন্তর্যন্ত্রণা, দুঃখবোধ প্রভৃতি বিদ্যমান আধুনিক নাট্যকাররা তাকেই রূপদান করেন নাটকে।

এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, নাটকের সবগুলো উপাদানের যথাযথ প্রয়োগ কোনো নাটককে সফল করে তোলে। পট বা ঘটনা এবং চরিত্রের পারস্পরিক সংযোগ ও সামঞ্জস্যই নাটকীয়তা সৃষ্টির নিয়ামক। কিন্তু ঘটনা ও চরিত্রের এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আপেক্ষিক। কোনো নাটকে ঘটনা আবার কোনো নাটকে চরিত্র প্রাধান্য পায়। জীবনের গভীর উপলব্ধির প্রাধান্য ট্র্যাজেডিকে করেছে চরিত্রপ্রধান। সংগ্রামশীল মানবজীবন, তার দ্বন্দ্ব ও বেদনার বাহন হিসেবে ঘটনার গুরুত্ব সর্বাধিক। কমেডি জীবনের বাইরের অসঙ্গতিকে কৌতুকময় করে প্রকাশ করে বলে সেখানে ঘটনা প্রাধান্য পায়। আধুনিক কালের কোনো কোনো নাটকে নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সমাজ, মানুষের অস্তিত্ব, ব্যক্তিমানুষ প্রভৃতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছে।

সংলাপ

সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে নাটকের পৃথক অবস্থানের কারণ এই সংলাপ। কেবল চরিত্রের কথা নয়, নাট্যকারের রসসৃষ্টি ও আইডিয়ার বাহনও এই সংলাপ। সংলাপের সার্থকতা নির্ভর করে পরিবেশ ও চরিত্রের মনোভাবের সঙ্গতির উপর। চরিত্রের ব্যক্তিত্ব কিংবা ব্যক্তিত্বহীনতা ফুটিয়ে তোলে এই সংলাপ। চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে হলে তার বাকভঙ্গির বিশিষ্টতা থাকতে হবে। যেমন দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকের নিমচাঁদের সংলাপ। তার মেধা, ব্যক্তিত্ব কিংবা ব্যক্তিত্বশূন্যতার বাহন তার ইংরেজি-প্রভাবিত সংলাপ। সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্‌র 'বহিপীর' নাটকের সংলাপ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপকেই ফুটিয়ে তোলে। সংলাপের ভাষা-বৈচিত্র্য কেবল চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করে না, নাট্যকারের স্বভাবধর্মকেও প্রকাশ করে।

নাটকের শ্রেণীবিভাগ

নাটকের বিষয় ও পরিণতি বিচার করে নাটককে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:

১. ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্তক নাটক

২, কমেডি বা মিলনান্তক নাটক

৩. প্রহসন

দ্বন্দ্বময় পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও পরিস্থিতির জটিলতায় পরাভূত মানবজীবনের করুণ কাহিনী ট্রাজেডির উপজীব্য। মিলানান্তক হলেও প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবতার, আকা ক্ষার সঙ্গে প্রাপ্তির এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের দ্বন্দ্ব অথবা বলা যায় মানবকর্মের অসঙ্গতি ট্র্যাজেডির মতো কমেডিরও উপজীব্য। কমেডিকে কয়েকটি প্রধান শ্রেণীভুক্ত করা যায়। যেমন কাব্যধর্মী বা রোম্যান্টিক কমেডি, সামাজিক কমেডি, চক্রান্তমূলক কমেডি প্রভৃতি। আবার কোনো কোনো সমালোচক কমেডিকে কল্পনাত্মক, ভাবপ্রবণ, বাস্তববাদী, বিদ্রূপাত্মক, সামাজিক ভাবপ্রধান প্রভৃতি ধারায় চিহ্নিত করেছেন। এছাড়াও রয়েছে নাটকের ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক রূপের দুই বহিচর্বিত ধারা। ছকের সাহায্যে নাটকের শ্রেণীবিভাগের বৈচিত্র্য নির্দেশ করা যেতে পারে:

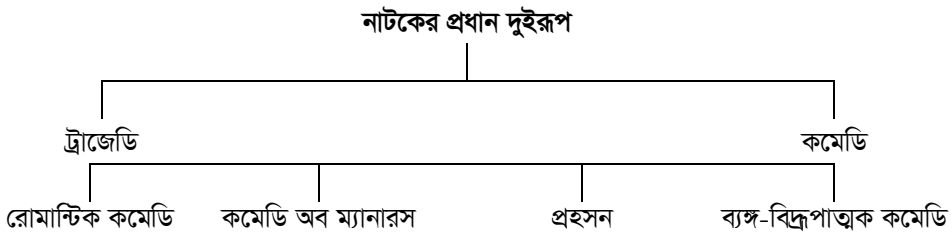

২.সাহিত্যের বিভিন্ন আন্দোলন-নির্ভর রূপরীতিগত বৈচিত্র্য:

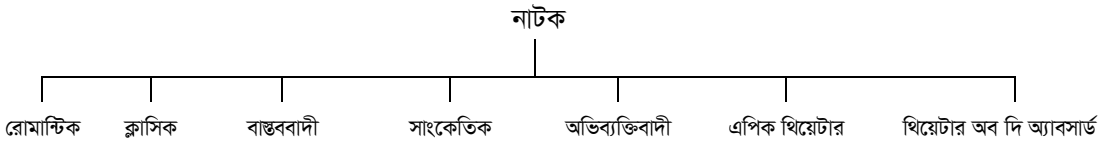

৩.বিষয়-গত রূপবৈচিত্র্য:

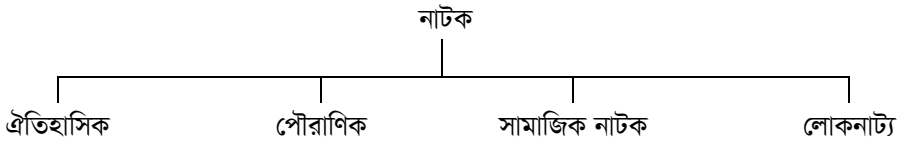

এছাড়াও আধুনিককালে সংযোযিত হয়েছে একাঙ্ক নাটক।

বাংলা নাটকের ইতিহাস

উপন্যাস ও ছোটগল্পের মতো বাংলা নাটকেরও সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু নাটকের ঐতিহ্য ও সূত্র বাঙালিজীবনে আদিকাল থেকেই ছিলো। যাত্রা, পালাগান, কবিগান এমনকি মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যেও নাট্যরীতির যথেষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান। উনিশ শতকে ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার ফলে সচেতনভাবে বাংলা নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন শুরু করে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু এর বেশ আগে থেকেই বাংলা ভাষায় নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ হতে শুরু করে। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয় যোগেন্দ্র চন্দ্রগুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' এবং তারাচরণ সিকদারের 'ভদ্রার্জুন'। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার নতুন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়িতে অভিনীত হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'।

বাংলা ভাষার প্রথম পর্যায়ের উলেখযোগ্য নাট্যকাররা হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৬) প্রমুখ। মাইকেল মধুসূদনের 'রত্নাবলী' নাটক ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়। তাঁর মঞ্চস্থ নাটকগুলোর মধ্যে 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৮), 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১), 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৫৯) উলেখযোগ্য। বাংলা নাটকের সমৃদ্ধি ঘটে মীর মশাররফ হোসেন, ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নাট্যশিল্পীদের হাতে। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা নাটকের গতি ও ঐশ্বর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায় নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর চেষ্টায়। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) এবং বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৫-১৯৭৭) পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে বাংলা নাটকে বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব আনেন। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় মঞ্চায়িত হওয়ার মধ্যদিয়ে বাংলা নাটক এক নতুন জগতে প্রবেশ করে।

বাংলাদেশের নাটক

অন্যান্য সাহিত্য-আঙ্গিকের মতো বাংলাদেশের নাটকেরও স্বতন্ত্র যাত্রাপথ চিহ্নিত হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এ-ভূখন্ডের স্বতন্ত্র জীবনরুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনা-রূপায়ণে দেশবিভাগ-পূর্বকাল থেকেই যাঁরা নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন, তাঁদের মধ্যে শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫) ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৯), আকবরউদ্দীন (১৮৯৫-১৯৭৮), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), শওকত ওসমান (১৯১৮-১৯৯৮) প্রমুখ উলেখযোগ্য। এঁদের হাতেই বাংলাদেশের নাটকের স্বতন্ত্র ভিত্তি তৈরি হয়।

১৯৪৭-এর দেশবিভাগের পর যাঁরা নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন তাঁদের মধ্যে নূরুল মোমেন (১৯০৮-১৯৮৯), সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্ (১৯২২-১৯৭১), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), আসকার ইবনে সাইখ (জন্ম-১৯২৫) উলে-খযোগ্য। নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস' (১৯৪৮) ও 'নয়াখান্দান' (১৯৬২), সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্র 'বহিপীর' (১৯৬০) ও 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬৪); মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২), 'বিধি' (১৯৬৬), ও 'কবর' (১৯৬৬) বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে কালজয়ী সংযোজন হিসেবে বিশিষ্ট। এছাড়া জসীমউদদীন, আজিমউদ্দীন আহমদ, রাজিয়া খান, আবদুল হক, সৈয়দ মকসুদ আলী, ফররুখ আহমদ, আনিস চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, মমতাজউদ্দিন আহমদ বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক-নিরীক্ষার বাংলাদেশের নাটককে বহুগুণে সমৃদ্ধ করেছেন।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে (১৯৭১-১৯৯৯) পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক থেকে নাটক যে সাফল্য অর্জন করেছে, গুণ ও মানবিচারে তা অন্যান্য সাহিত্য-শাখাগুলোকে ছাড়িয়ে যাবে। স্বাধীনতার অব্যবহিত-পূর্বে যাঁরা নাটক রচনা শুরু করেন, স্বাধীনতার পর তাঁদের হাতেই বাংলাদেশের নাটক সমৃদ্ধি লাভ করে। নাটকের বিষয়ভাবনা পটবিন্যাস এবং চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে এই সব নাট্যকারগণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেন। মমতাজউদ্দিন আহমদ এবং সাঈদ আহমদ এ-ক্ষেত্রে স্মরণীয় নাট্যকার। স্বাধীন বাংলাদেশের নাটক যাঁদের সাধনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে আবদুলাহ আল মামুন, সেলিম আল দীন, মামুনুর রশীদ, সৈয়দ শামসুল হক এবং জিয়া হায়দারের নাম বিশেষভাবে উলেখযোগ্য।

বস্তুসংক্ষেপ: নাটকে ঘটনা, চরিত্র, চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আচার-আচরণ উচ্চারিত সংলাপের মাধ্যমে রূপ লাভ করে। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু, পাত্র-পাত্রী এবং দর্শকের যৌথ উপস্থিতিতে এটি হয়ে ওঠে সমবায়িক শিল্প। মানুষের জীবন সরলরেখায় শান্ত-স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে প্রবাহিত হয় না। এ-ধরনের জীবন থাকলেও তা নাটকীয়তা বর্জিত। মানুষের জীবন ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে প্রবহমান। দুর্ভোগ, যন্ত্রণা, বিক্ষোভ, অশান্তি প্রভৃতির আকস্মিক আঘাতে মানুষের জীবনে গতি ও বৈচিত্র্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। জীবনের এই গতি ও বৈচিত্র্যকে শিল্পে ধারণ করার প্রয়োজন থেকেই নাটকের উদ্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. নাটক কাকে বলে?
২. নাটকের পট বলতে আমরা কি বুঝি?
৩. নাটকের শ্রেণীকরণ করুন।
৪. ট্র্যাজেডি বলতে আমরা কি বুঝি?

১ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তর:

সংলাপ নাটকের অন্যতম বিশিষ্ট একটি লক্ষণ— যা সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে নাটককে পৃথক করেছে। চরিত্রের মুখ থেকে উচ্চারিত হলেও সংলাপে নাট্যকারের জীবন-দৃষ্টিরই প্রতিফলন ঘটে। একটি নাটকে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র থাকে। তারা একই ভাষায় কথা বলে না। তাদের সামাজিক, শ্রেণীগত কিংবা বৃদ্ধিবৃত্তিগত অবস্থান নির্দেশিত হয় তাদের উচ্চারিত সংলাপে। যে কারণে আদিকাল থেকেই নাট্যকার সংলাপকে কেবল নাটকের নয়, চরিত্রের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

পাঠ-৭

প্রবন্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- প্রবন্ধ কাকে বলে সে সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- প্রবন্ধের রীতি-বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।

সংজ্ঞার্থ

সাহিত্যের অন্যান্য রূপ নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, প্রবন্ধ নিয়ে এতোটা হয়নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং নাটককেই সাহিত্যের সৃষ্টিশীল আঙ্গিক মনে করা হয়। অবস্থান-বিচারে কোনো কোনো সমালোচক প্রবন্ধকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যরূপ (Literary Form) মনে করেন। কিন্তু আধুনিককালে মানুষের বুদ্ধি, যুক্তি এবং চিন্তানির্ভরতা প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিকতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রবন্ধ বলতে আমরা সাধারণত এমন এক ধরনের গদ্য রচনাকে বুঝি, যা আলোচনার মাধ্যমে কোনো বিশেষ বক্তব্য, দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা বিষয়-অন্তর্গত বক্তব্যকে উপস্থাপন করে— চিন্তা এবং যুক্তির পরস্পর মিলনে পাঠককে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করে। ইংরেজি Essay-র প্রতিশব্দ হিসেবে প্রবন্ধকে গ্রহণ করে থাকেন অনেকে। কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রবন্ধের ক্ষেত্র ইংরেজি Essay-র তুলনায় ব্যাপক। 'ইংরেজিতে Treatise, discourse বা dissertation জাতীয় রচনার সঙ্গে প্রবন্ধের পার্থক্য বিদ্যামান। ওই তিনটি সংজ্ঞায় বিশেষ ধরনের 'নিয়মতান্ত্রিক' ও 'সম্পূর্ণ' বিষয়োন্মোচন বোঝায়— যে নিয়মের শাসন বা সম্পূর্ণতা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে সব সময় মেনে চলা হয় না।' আরও উলেখ্য যে, Treatisc বা dissertation জাতীয় রচনা নির্দিষ্ট 'সীমাবদ্ধ' পাঠকশ্রেণীর জন্য রচিত হয়। কিন্তু প্রবন্ধ রচিত হয় 'সাধারণ পাঠকের' দিকে লক্ষ রেখে। এ-কারণে বিষয় বা পরিভাষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো নীতিও মেনে চলে না প্রবন্ধ। বরং বক্তব্য বা বিষয় উপস্থাপনের প্রয়োজনে কখনো গল্প, কখনো দৃষ্টান্ত, কখনো কৌতুক, আবার কখনো সূক্ষ্ম-অনুভূতি প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠকের বুদ্ধি ও যুক্তিকে জাগ্রত করাই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

প্রবন্ধের রূপগত বৈশিষ্ট্য

ইংরেজিতে যেমন Essay-র সমধর্মী বেশ কিছু পরিভাষা— যেমন Treatise, dissertatorn, dircouse) রয়েছে, বাংলা ভাষায়ও অনরূপ কিছু শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন— নিবন্ধ, সন্দর্ভ, প্রস্তাব প্রভৃতি। এই শব্দগুলোর প্রয়োগ সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রাচীন-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে লক্ষ করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যচর্চার ক্ষেত্রে উক্ত শব্দগুলো বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন লেখকরা। কোনো গ্রন্থের টীকা অর্থে 'নিবন্ধ' শব্দটি ব্যবহৃত হতো সংস্কৃত সাহিত্যে, 'সন্দর্ভ' শব্দটির অর্থ সম্যকরূপে গ্রন্থন, রচনা বা সংগ্রহ। উনিশ শতকে বাংলা গদ্যসৃষ্টির সূচনাপর্বে ব্যাখ্যানমূলক, বিতর্কমূলক ও বর্ণনামূলক রচনাকে 'প্রস্তাব' বলে আখ্যায়িত করা হতো। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মনীষীরা তাঁদের বিভিন্নধর্মী গদ্যরচনাকে 'প্রস্তাব' নামে চিহ্নিত করতেন। রামগতি ন্যায়রত্ন 'প্রস্তাব' শব্দটিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছিলেন। উনিশ শতকের সত্তর দশক থেকেই মূলত গভীর চিন্তা, ব্যাখ্যা ও বিশেষণমূলক গদ্যরচনাকে প্রবন্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করা শুরু হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা গদ্যরচনার সংকলনের নাম দেওয়া হয় প্রবন্ধপুস্তক (১৮৭৯)।

প্রবন্ধ শব্দটির আভিধানিক অর্থ (প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন) থেকেই এর রূপগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। এক সময় মনে করা হতো যুক্তি ও মননশীলতার প্রয়োগে সৃজনশীল মৌলিক শিল্পকর্মসমূহকে (যেমন, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প) মানুষের বোধের আয়ত্বে নিয়ে আসা প্রবন্ধের অন্যতম একটি কাজ। মানুষের জীবনের অন্যান্য প্রসঙ্গ যেমন সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, দর্শন, নন্দনতত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিক্ষা— এগুলোও প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে প্রবন্ধরূপী এমন কিছু সৃষ্টি বিভিন্ন কালে হয়েছে, যেগুলো অনেকটা মৌলিক সৃষ্টি কর্মের পর্যায়ভুক্ত। প্লেটোর Dialogue কিংবা এ্যারিস্টটলের Poetics গ্রন্থ দুটি মৌলিক কোনো সাহিত্যকর্মের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু অনেক

মৌলিক সৃষ্টির চাইতে তার প্রাসঙ্গিকতা এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান। সাহিত্যবিচারের মৌলিক মানদন্ডের মতো এগুলো যে ভাবীকালেও গ্রহণীয় থাকবে সে-বিষয়ে কোনা সন্দেহ নেই।

প্রবন্ধের বিষয়ের ক্ষেত্র বিচিত্র। সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি, দর্শন, নন্দনতত্ত্ব এমনকি অতি সাম্প্রতিক প্রসঙ্গও প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে। প্রতিটি বিষয়কে অনিবার্য ভাষারূপের মাধ্যমে উপস্থাপন করা প্রাবন্ধিকের ধর্ম। এ-ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গটিও তাৎপর্যপূর্ণ। বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধের ভাষা আর বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভাষা এঁদের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যের কারণেই বিভিন্ন। পাঠক্রমভুক্ত পাঁচটি প্রবন্ধ বিশেষণ করলেই এ-উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের গদ্যরীতি বিষয়বস্তুর কারণেই বস্তুনিষ্ঠ-তথ্যনির্ভর এবং বিশেষণধর্মী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের বিষয় যেমন বিশ্বজনীন মানব-জীবন ও অস্তিত্বনির্ভর, তেমনি এর ভাষাও যেন অনেকটা মন্ত্রোচ্চারণের মতো। আশি বছর বয়সের রবীন্দ্রনাথ ধ্বংসমত্ত সভ্যতা ও জীবনের বিপন্ন পটভূমিতে দাঁড়িয়ে 'সভ্যতার সংকট' রচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর বৈদগ্ধ্য, নিরাসক্তি ও পরিমিতিবোধ 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' লেখকের সমাজ ও সংস্কৃতি অন্বেষার রূপায়ণ। 'বাংলা গদ্যরীতি' প্রবন্ধে মুনীর চৌধুরী বিষয়ের প্রয়োজনেই বর্ণনাত্মক ও বিশেষণধর্মী ভাষা প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ অন্বিষ্ট সত্যকে যথার্থ রূপে প্রকাশের প্রয়োজনে দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষারীতির সম্পর্কে সচেতনতা লেখকের জন্য অপরিহার্য।

প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ

বিষয়ের প্রকৃতি ও উপস্থাপন-বৈশিষ্ট্য বিচারে প্রবন্ধকে প্রধানত দুটি শ্রেণীভুক্ত করা হয়:

১. বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় প্রবন্ধ (Formal or Informative Essay)

২. ভাবনিষ্ঠ বা মন্ময় প্রবন্ধ (Familiar of Intimate Essay)

বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক নিরাসক্তভাবে বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে যুক্তিশৃঙ্খলার মাধ্যমে গভীরভাবে বিষয় বিশেষণ করেন। চিন্তাশীল অনুসন্ধানী পাঠক এ-জাতীয় প্রবন্ধের অনুরাগী। বঙ্কিমবন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' Formal প্রবন্ধের গোত্রভুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রবন্ধপুস্তক' বা 'বিবিধ প্রবন্ধ', জ্যোতিরিন্দ্র নাথের 'প্রবন্ধমঞ্জুরী', রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'নানা প্রবন্ধ', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'প্রবন্ধাবলী', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রবন্ধমালা', ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'পারিবারিক প্রবন্ধ', কাজী মোতাহের হোসেনের 'সংস্কৃতি কথা', মুনীর চৌধুরীর 'বাংলা গদ্যরীতি' বস্তুনিষ্ট প্রবন্ধ বা Formal Essay-র দৃষ্টান্ত।

ভাবনিষ্ট মন্ময় প্রবন্ধকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। এজন্যেই এ-জাতীয় প্রবন্ধের শ্রেণীকরণে Familior of Personal শব্দগুলো প্রয়োগ করা হয়। এ-ধরনের প্রবন্ধে বিষয়বস্তু অপেক্ষা লেখক পাঠককেই বেশি গুরুত্ব দেন লেখক। নিজ অনুভূতিকে পাঠকের অনুভূতি ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে চান। বলা যায়, এ-জাতীয় প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তিসত্তার 'আত্মপ্রকাশ' ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'লোক রহস্য', রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' এ-জাতীয় প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্যোতির্ময় রায়, বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী সাহিত্য ছাড়াও অন্যান্য বিষয় নিয়েও Informal বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন।

প্রবন্ধের রূপ ও রীতি বহু বিচিত্র। লেখকের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও চিন্তার বহুমুখিতা প্রবন্ধের ক্ষেত্রকে করেছে বৈচিত্র্যময়, বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। ফলে সাম্প্রতিককালে প্রবন্ধ অধিকমাত্রায় ব্যক্তিত্বচিহ্নিত হয়ে উঠছে। অন্নদাশঙ্কর রায়, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, আবু সায়ীদ আইয়ুব, শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত দুই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায়ই পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক থেকে বাংলা প্রবন্ধকে এঁরা সৃজনশীল সাহিত্যরূপের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

বাংলা প্রবন্ধ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা গদ্যের উদ্ভবের সঙ্গে প্রবন্ধ-লক্ষণাক্রান্ত বাংলা রচনার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ইংরেজ রাজকর্মচারীরা বাংলা শেখার উদ্দেশ্যে কিছু প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০) তার মধ্যে অন্যতম। সচেতনভাবে বাংলা গদ্যচর্চার সূত্রপাত এখান থেকেই। রাজ রামমোহন রায়ের ধর্মচিন্তামূলক রচনা এবং 'দিগ্‌দর্শন', 'সমাচার দর্পন' (১৮১৮), 'সংবাদপ্রভাকর' (১৮৩১) ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (১৮৪৩) সংবাদ, প্রতিবেদন ও রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা প্রবন্ধের ভিত্তি তৈরি হয়। উনিশ শতকেই বাংলা গদ্য ব্যক্তির চিন্তা ও আত্মপ্রকাশের পরিপূর্ণ বাহন হয়ে ওঠে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার (১৮২০-১৮৯১) অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৭), ভূদের মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০), রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩২-১৮৯৫) প্রমুখের চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের স্বতন্ত্র বাহন হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ বাংলা প্রবন্ধকে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি দান করেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, সৈয়দ মুজতবা আলী, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, হুমায়ুন কবির, গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায়, আবু সায়ীদ আইয়ুব প্রমুখের চেষ্টায় বাংলা প্রবন্ধ বিষয়ভাবনা ও রূপ-রীতির পরীক্ষা নিরীক্ষায় বিশ্বমাণে উপনীত হয়।

বাংলাদেশের প্রবন্ধ

বাংলাদেশের প্রবন্ধের পটভূমি তৈরি হয় বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯২১) পরিএন্ডলে। মুসলিম সাহিত্য সমাজ 'লিখা' পত্রিকার (১২৬৯) মাধ্যমে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের চর্চা করতে গিয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজ আধুনিক বুদ্ধি ও গভীর চিন্তা সম্বলিত প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ-পর্যায়ের লেখকদের মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদ, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আব্দুল কাদির, আবুল ফজল প্রমুখ উলেখযোগ্য। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী মোতাহার হোসেন, মুহাম্মদ এনামুল হক ১৯৪৭-এর দেশ-ভাগের পূর্বেই বাংলাদেশ-কেন্দ্রিক স্বতন্ত্র প্রবন্ধশৈলীর ভিত্তি তৈরি করেন।

১৯৪৭-এর দেশ-ভাগের পর নতুন সামাজিক-রাষ্ট্রিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রাবন্ধিকগণ সাহিত্যবিচারের পাশাপাশি সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি বিষয়েও প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। এ-সময়ের নবোদ্ভূত প্রাবন্ধিকদের মধ্যে আবু জাফর শামসুদ্দীন, রনেশ দাশ গুপ্ত, শওকত ওসমান, আবদুল হক, সৈয়দ আলী আহসান, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, আহম্মদ রফিক, আনোয়ার পাশা, আহমদ শরীফ, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ উলেখযোগ্য। সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিচিত্র পরিসরে এই সব প্রাবন্ধিকের চিন্তা ও অনুভূতি পরিভ্রমণ করেছে। এঁদের অব্যবহিত পরে প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেন বদরুদ্দীন উমর, আবদুল হাফিজ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আনিসুজ্জামান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আহমেদ হুমায়ুন, মোহাম্মদ মাহফজউলাহ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ। এঁদের প্রায় সকলেই বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

ষাটের দশকের নবোদ্ভূত প্রাবন্ধিকেরা প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও ভাষারীতির ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনা সঞ্চারে মনোযোগী হন। এ-ধারার প্রাবন্ধিকদের মধ্যে আবদুলাহ আবু সায়ীদ, হায়াৎ মামুদ, আহমদ ছফা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ আকরম হোসেন, শামসুজ্জামান খান, আবুল কাসেম ফজলুল হক, হুমায়ুন আজাদ উলেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের প্রবন্ধের রূপ ও রীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এঁদের অবদান এখনো পর্যন্ত গতিশীল ও বৈচিত্র্যময়।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের প্রবন্ধ নিত্যনতুন চিন্তা ও চেতনায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বিশ্বসাহিত্যের অনুভূতি ও চিন্তাস্রোতের সঙ্গে সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সাহিত্যের পর্যবেক্ষণেও নিত্যনতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

বস্তুসংক্ষেপ

প্রবন্ধ বলতে আমরা সাধারণত এমন এক ধরনের গদ্য রচনাকে বুঝি, যা আলোচনার মাধ্যমে কোন বিশেষ বক্তব্য, দৃষ্টি-ভঙ্গি কিংবা বিষয়-অন্তর্গত বক্তব্যকে উপস্থাপন করে—চিন্তা এবং যুক্তির পরস্পর মিলনে পাঠককে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করে। প্রবন্ধ রচিত হয় 'সাধারণ পাঠকের' দিকে লক্ষ্য রেখে। এ-কারণে প্রবন্ধ বিষয় বা পরিভাষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন নীতিও মেনে চলে না। বরং বক্তব্য বা বিষয় উপস্থাপনের প্রয়োজনে কখনো গল্প, কখনো দৃষ্টান্ত, কখনো কৌতুক, আবার কখনো সূক্ষ্ম-অনুভূতি প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠকের বুদ্ধি ও যুক্তিকে জাগ্রত করাই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রবন্ধের রূপগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা জানেন বিস্তারিত লিখুন।

২. প্রবন্ধ কাকে বলে? প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন

সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রবন্ধ কাকে বলে?

২. প্রবন্ধকে কি মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত করা যায়?

৩. প্রবন্ধের শ্রেণীকরণ করুন।

৫. বাংলাদেশের প্রবন্ধের ধারা বর্ণনা করুন।

১ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

মৌলিক সাহিত্যরূপ (Literary Form) বলতে আমরা সাধারণত কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্পকে বুঝে থাকি। উনিশ শতকে প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনেই হয়েছিলো। বুদ্ধি এবং যুক্তির প্রাধান্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। প্রথম পর্যায়ের প্রাবন্ধিকগণ সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি কিংবা রাজনীতির বিশেষণে প্রবন্ধের গদ্যময় আঙ্গিককেই অনিবার্য মনে করেছিলেন। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে প্রবন্ধ মানুষের অনেক মৌলিক জিজ্ঞাসাকেও প্রকাশ করছে। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ কিংবা বুদ্ধদেব বসুর অনেক প্রবন্ধই মৌলিক জীবনানুভূতির প্রকাশক। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' এবং বুদ্ধদেব বসুর অনেক প্রবন্ধই মৌলিক চিন্তা ও অনুভূতির বাহন হয়ে উঠেছে। এবং সাম্প্রতিক সময়ে বুদ্ধি ও যুক্তির পাশাপাশি মানুষের অনেক মৌলিক চিন্তা ও অনুভূতি প্রবন্ধে অভিব্যক্ত হচ্ছে। ফলে বিষয় ও রূপের এ-জাতীয় মিলন অনেক প্রবন্ধকে মৌলিক সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত করেছে।